করুণা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

আড়াই টাকা

প্রথম সংস্করণ

শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীপ্রবোধকুমার সিংহ কর্তৃক মহানন্দ প্রিন্টিং হাউস, ৭ স্বক্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ হইতে মুদ্রিত।

১

১৯১৭-১৮ সালের কথা।...

আমার বয়স তখন ছাব্বিশ বছর—জার্মান যুদ্ধ চলেছে পুরোদমে। কাইশার যেন কল্কি-অবতার হয়ে দুনিয়া ছারখার করে' দেবে। আমি ঢুকেছি আর্মিতে। এ চাকরিতে যে ঝোঁক ছিল, তা নয়—পেটের দায়ে সংসারের জন্ত। বাবা সরকারী চাকরি করতেন—পেন্সন নিয়েছেন। সংসারে মা, আমরা চার ভাই, দুটি বোন। বড় বোনের বিয়েয় বাবার সামান্ত যা-কিছু সঞ্চয়, তা গেছে বেরিয়ে। পেন্সন যা পান, তাতে সংসার চলে না। আমাদের দু-ভাইয়ের অন্তত চট্‌পট্‌ রোজগার করা দরকার—না হলে মধ্যবিত্ত-সমাজের ভদ্রতা আর মর্য্যাদা বজায় রেখে লোকালয়ে বাস করা প্রায় অসম্ভব! লোক-লৌকিকতা যদি বজায় না রইলো, তাহলে ভদ্র বলে কেই বা স্বীকার করবে! অথচ ...

বড় ভাই বি. এ. পাশ করতে একটা চাকরি বাবা মিলিয়ে দিলেন, কিন্তু পড়ার চাপ, তার উপর সংসারে ছিল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং সর্ব্বোপরি আমাদের ভাগ্য—এই ত্র্যহস্পর্শ সংযোগের ফলে দাদার চোখ দুটি হলো খারাপ—এমন, যে চোখের সে অতি-ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে অপরকে খুঁজে আশ্রয় ধরাটুকু চলে, চাকরি চলে না! স্কুলের চাকরি গেল। কাজেই আমার পালা! সেই কোন্ রূপকথার গল্পে পড়েছিলুম, দৈত্য না রাক্ষসের পুরীতে একজন করে মানুষ পাঠানো চাই পালা করে ... এ ঠিক তেমনি সংসার দৈত্য ... ভুখা হুঁ চীৎকার তুলে চলেছে ... একজনকে তার সে ডাক শিরোধার্য্য করতে হবে তো।

আমার স্বাস্থ্য ভালো—মজবুত্ শরীর—তাই পাঁচজন মুরুব্বি ধরে' বাবা আমাকে ঢুকিয়ে দিলেন মিলিটারীতে। কামানের মুখে দাঁড়াবার জন্য তখন মানুষ দরকার—সেধে-বেচে যে দাঁড়াতে চায়—তার পক্ষে চাকরির ও-ফটক তখন খোলা ছিল! ও-চাকরিতে ঢুকোনো—যেন কলের চাকায় জুতে দেওয়া—ওতে আর তেল দেবার দরকার নেই—বেঁচে থাকলে ঐ চাকায় চড়ে যতখানি উঠে যেতে পারো! মিলিটারীতে যারা চাকরি করে, কালা-ধলা রঙের পার্থক্য ধরে বিচারে উনিশ-বিশ ফারাক ঘটলেও কালার মারটা বড় ঘটতো না!

ভাগ্য ছিল প্রসন্ন। চাকরিতে যে গোরা-মনিব জুটলো আমাকে তাঁর খুব বেশি কেমন পছন্দ হয়ে গেল এবং আমাকে তিনি তাঁর ন্যাংবোট করে' নিলেন। তিনি ছিলেন একটা ডিভিশনের কমাণ্ডে। আমি ··· কথাটা গোপন করবো না—সুপুরুষ বলে' আমার খ্যাতি ছিল, তার উপর স্পোর্টসে দখল, গান গাইতে পারতুম—বেহালায় হাত ছিল, ফটোগ্রাফিরও চর্চ্চা করেছি কিছু কিছু—মানে, মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংসারে যতটুকু সম্ভব, তার চেয়ে বেশি—কাজেই আমার অফিসার ও'ব্রায়েন সাহেব আমাকে প্রাইভেট্ থেকে চট্‌পট্ লেফটেনাণ্ট বানিয়ে দিয়েছিলেন। তখনকার যুগে এ-আশা ছিল স্বপ্নের মতো! এবারকারের যুদ্ধে যেমন মশা-মাছিগুলো পর্য্যন্ত আর্মিতে ঢোকার ফলে গৃধ্র শকুনি বনে' জাঁকালো চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে, তখন এ-সব সম্ভব ছিল না। কারণ ইংরেজ তখন এদেশ ছেড়ে যাবার কল্পনা করেনি, এবং ঘরে ঘরে কাজের মানুষগুলো এবারকারের মতো এমন নির্ম্মূল হয়ে যায়নি।

১৯১৭ সালের অক্টোবরে আমাদের রেজিমেণ্ট আস্তানা পাতলো গিয়ে লক্ষ্ণৌ ক্যাণ্টনমেণ্টে! কোথায় যুদ্ধক্ষেত্র সমরাঙ্গন আর কোথায়

বা লক্ষ্মৌ। সে-যুদ্ধের সময় বোমা ফেলাফেলি ছিল অজ্ঞাত—যত আতঙ্ক তখন ছিল সাগর-কূলে সীমাবদ্ধ—কাজেই আমরা সাজসজ্জা করে পরম আরামে বাস করছিলুম—সম্ভাবনা ছিল, কবে ভারত ছেড়ে কালাপানি পার করিয়ে আমাদেরও পাঠাতে পারে বস্‌রা প্রভৃতি অঞ্চলে—কিন্তু সে সম্ভাবনার ভয় আমাদের মনে থিতুতে পারতো না।

লক্ষ্মৌ রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণে ক্যান্টনমেন্ট। ব্যারাকে থাকি। ব্যারাকের গায়েই দিলখুশা—সেখানে দল বেঁধে বেড়াই—মহম্মদবাগ ক্লাবে তাসের আড্ডা বসে—চায়ের সঙ্গে তাস আর হৈ-হল্লা! তার ওপর আছে দাবা, বিলিয়ার্ড এবং খানাপিনার আরাম আর আরাম!

নভেম্বরের মাঝামাঝি। বিকেলে ক্যান্টনমেন্টের এলাকা পার হয়ে সোজা উত্তরে লা মার্টিনিয়ার কলেজের কাছাকাছি বড় একটা দোকান—সেই দোকানে গেছি—এ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার সামশুল—মুসলমান ভদ্রলোক—বিলিয়ার্ড খেলতে আমাদের ক্যান্টনমেন্টে আসেন, তাই থেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ এবং এদিককার বনেদী বড় ঘরের ছেলে—আলাপ বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সামশুলের কামরায় বসে একখানা নভেল পড়ছি, সামশুল দেখছে কতগুলো হিসেব—এমন সময় দরজার পর্দ্দা ঠেলে কামরায় ঢুকলেন এক কিশোরী—যেন একঝলক বসন্ত বাতাস কিম্বা মনে হয়েছিল জলের ঢেউয়ের মতোই স্বচ্ছন্দ সহজ তাঁর গতি—পরনে দামী সিল্ক শাড়ী—মাথায় আবরণ নেই—গায়ে ফারের একটা কোট, গলায় শালের স্কার্ফ। তাঁর পানে চেয়ে আমার চোখের দৃষ্টি অপলক হলো, নিথর হয়ে রইলো—অপরিচিতা কিশোরীর পানে এমন করে' চেয়ে থাকা অন্যায়, ইতরতা—সে অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিশোরী আমার পানে ফিরেও তাকালে না। সামশুলকে উদ্দেশ

করে' বললেন—চোস্ত উর্দ্দু হিন্দীতে, অর্থাৎ যা বললেন, তার মর্ম্ম—এই নিন্ লিস্ট—এগুলো যতশীঘ্র সম্ভব, আপনাদের বেয়ারা দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন—আমাদের বাড়ী। আমি দাঁড়াতে পারবো না—ভয়ানক ব্যস্ত—

তিনি একটা ফর্দ্দ দিয়ে চলে গেলেন—আসা এবং যাওয়া যেন বিদ্যুতের ক্ষণেক চমক, কিন্তু ঐ ক্ষণ-চমকটুকুর মধ্যেই আমি লক্ষ্য করলুম, সামশুলের সসম্ভ্রম আত্মনিবেদন—কিশোরীর নির্লিপ্ত ভঙ্গী এবং তিনি চলে যাবার পরক্ষণেই সামশুলের দারুণ চাঞ্চল্য।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে সামশুল ফিরে এলো। এই পনেরো মিনিট আমি বসে আছি স্তম্ভিত, স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো—সামশুলকে দেখে আমার চেতনা ফিরলো—প্রশ্ন করলুম, এই ফ্ল্যাশ আর লাইট্—ইনি হন কে?

মৃদু হেসে সামশুল বললে, চেনো না? কখনো দেখোনি, লক্ষ্ণৌয়ে আছো এ্যাদ্দিন?

না।—ক্যাণ্টনমেণ্টে এমন বিজলী চমক দেখা সম্ভব নয়তো!

সামশুল বললে, কিন্তু শহরে বেরোও তো—

আমি বললাম, তর্ক রাখো, কে, বলো—

সামশুল বললে, এখানে আছেন মিস্টার চাকারবার্টি—বাঙালী হে ··· তাঁর ভাইঝি। মিস্টার চাকারবার্টির পরিচয় নিশ্চয় জানো।

যেভাবে একথা সে বললো, মনে হলো, যেন একখানা হাজার টাকার নোট্ ফেলে দিলে আমার সামনে! ভেবেছিল সেইটুকু ধরে' আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে জবাব দেব, বটে—ও তাই নাকি! কিন্তু তা হলো না। কারণ, এখানে এসে অবধি শহরের গণ্যমান্য বা বদান্য কোনো ব্যক্তির কথা কারো কাছে শুনিনি—ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আমি পরিচয় নিয়েছি, এবং জেনেছি, আসফউদ্দৌলা ··· মহম্মদ আলি শাহ—

এইসব নবাব বাদশায়, আর দেখবার মধ্যে দেখে বেড়িয়েছি শুধু ঐ ইমামবাড়া, উত্তর মঞ্জিল।

সামশুল দিলো পরিচয়—এতল্লাটে মিস্টার চাকারবার্টির মতো ধনীমানুষ আর নেই! নবাব বলো, তালুকদার বলো, ওঁর তুলনায় অতি সামান্য নগণ্য জন! তিনি থাকেন শহরের ওদিকে—গুমতির ওপারে আছে দলিগঞ্জ মহল্লা—ওখানটাকে বলে হায়দ্রাবাদ—সেই-খানে প্যালেসের মতো বাড়ী, মাথায় মিনার, নবাবী বাগান—এককালে ওখানে ছিল নবাব আসফউদ্দৌলার তয়খানা—জায়গাটা উঁচু করে' পাহাড়ের ছাঁদে গড়ে' তার উপরে বাড়ী-বাগান—লোকের বসতি ওধারটায় নেই! কতবড় কমপাউণ্ড—উইংফীল্ড পার্ক তার পাশে খেলনার মতো মনে হয়। ওঁর কতগুলো কারবার—ডেয়ারি ফার্ম্ম, বাহাদুরগঞ্জে মস্ত সুগার ফ্যাক্টরি—তা ছাড়া, গালচে-সতরঞ্চির মস্ত কারখানা—কানপুরে ন্যাশনাল স্থু ওয়ার্কস—ঘোড়ার আড়গড়া—এসবের সোল ওনার মিস্টার চাকারবার্টি! লক্ষ্ণৌয়ে, কানপুরে, এলাহাবাদে অসংখ্য বাড়ী—সে সব বাড়ীতে বড় বড় ইংরেজ ভাড়াটে! যাকে বলে, টাকার টাঁকশাল! শীতের সময় ভদ্রলোক এখানে থাকেন—গ্রীষ্মে থাকেন গিয়ে নৈনিতালে, নয় দেরাদুনে—দু জায়গাতেই নিজের বড় বড় বাড়ী আছে। থাকেন আমীরী চালে! সাহেবরা বলে, নবাব চাকারবার্টি। অতিথি-অভ্যাগত গেলে—তা সে আমীর হোক আর ফকির হোক খাতির করেন। ভদ্রলোক এদিকে ভারী সরল, অমায়িক। মানে, এ-যুদ্ধে লাখ টাকা দান করেছেন এক কথায়—রেডক্রশে। গবর্নমেণ্ট ওঁকে রাজা টাইটেল দিতে চেয়েছিল, ইনি সনির্বন্ধ মিনতি জানিয়ে তাতে তুলেছিলেন আপত্তি।

সামন্তুল বললে—অতবড় প্রাসাদ—যাও, মনে হবে অতিথশালা। কমপাউণ্ডে গেস্ট হাউস আছে—সে হাউসে সব সময়েই মানুষ গম্ গম্ করছে।

বললে, আমি যদি যাই, ভয়ানক খাতির পাবো—আর্মির লোকদের খুব বেশিরকম খাতির যত্ন করেন।—যাবে?

চট্ করে জবাব দিতে পারলুম না। মনের মধ্যে চিন্তার চাকা ঘুরতে লাগলো, একবার ভাবলুম, মন্দ কি! এখানে ব্যারাকে বাস করছি যেন পাঁক-পুকুরে হাঁসের মতো—দিবারাত্রি শুধু প্যাঁক প্যাঁক করা! তার চেয়ে—আবার মনে হলো, বামন মানুষ—কাজ কি আমার চাঁদের উপরে লোভ করে!

আজ এ বয়সে মনের কথা গোপন করবো না—সেদিনকার ও-বয়সে টাকাকড়ি, স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আশাতীতভাবে আয়ত্ত হলেও মনখানা খাঁ-খাঁ করতো। মনে হতো, এত কিছু পেয়েও আসল কিছু পাইনি। পথেঘাটে ট্রেনে খুবই ঘোরাঘুরি করে' বেড়াই—রেসিডেন্সিতে চলেছি গুমতির ধার দিয়ে—যেতে যেতে দেখি কিশোরীর মেলা—লা মার্টিনিয়ারের কম্পাউণ্ডে বিকেলের দিকে দেখি কিশোরীরা করছে ছুটোছুটি, বাস্কেট বল খেলছে, হকি খেলছে, সেইসঙ্গে হাসিগল্পের ছিটে ছিটকে এসে লাগে—মন একেবারে কাঙাল হয়ে ভাবে—

কিন্তু ও শুধু মনে মনে স্বপ্ন দেখা!—ও স্বপ্ন সফল করে' তোলবার কোন সম্ভাবনা নেই—বিশেষ, আমার জীবনে।—সামন্তুলের কথা যা শুনলুম—তার উপরে স্বচক্ষে দেখলুম যে স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ—মনে হলো, ওবাড়ীতে অতিথি হয়ে প্রবেশাধিকার পেলে ঐ রূপসী কিশোরীর সান্নিধ্য—

সামন্তুল বললে—আমাদের স্টোরের খুব বড় খদ্দের। উনি হলেন

মিস্টার চাকারবার্টির ভাইঝি—চাকারবার্টির স্ত্রী নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটি মেয়ে আর এই ভাইঝি—তুমি যদি বলো, আমি পারি তোমাকে ওবাড়ীতে ইনট্রোডিউস্ করে দিতে।

মনের মধ্যে তখনো কত চিন্তা চলেছিল—স্বপ্নে আর সত্যে বারবার লাগছিল ঠোকাঠুকি—তার ফলে শীতের দিনেও আমার কপালে ফুটলো ঘর্ম্মবিন্দু।

রুমালে মুখ মুছে সবলে নিশ্বাস চেপে বললুম—বাঙালী মানুষ, ইচ্ছা হচ্ছে আলাপ করতে। মাঝে মাঝে ডাল্ রুটিন্ ছেড়ে একটু মেলা-মেশা—বাঙলায় দু-চারটে কথা কওয়া … সত্যি সামশুল, এখানে এসে ইস্তক বাঙলা ভাষা যেন ভুলতে বসেছি—কথাবার্ত্তা বলছি—হয় ইংরেজীতে, নয় ভাঙ্গা হিন্দীতে—এক এক সময় দুর্বিসহ মনে হয়।

সামশুল বললে—অল্ রাইট মাই ফ্রেণ্ড।

২

সামশুল কথার মানুষ—দুদিন পরে আমার নামে এলো কার্ড—সামনের রবিবারে বেলা চারটেয় ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ। সামশুল দিলে আমার হাতে কার্ড—কার্ডে সুস্পষ্ট অক্ষরে আমার নাম লেখা। মিস্টার চাকারবার্টি সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, গ্রহণ করলে তিনি কৃতার্থ হবেন।

নিমন্ত্রণ শিরোধার্য্য করলুম।

তারপর রবিবারের কথা—ছেলেবেলায় সরস্বতী পূজার দিনে মন যেমন খুশিতে ভরে উঠতো—আমার মন তেমনি। ভালো ইউনিফর্ম্ম ইস্ত্রী করিয়ে আনিয়ে রেখেছিলুম—বোতামগুলো পালিশে ঝক্ঝক্ করছে, চোস্ত করে দাড়ি কামালুম। এবং বেলা দুটো বাজতে না বাজতে সাজপোশাক পরে তৈরি! আমাদের বেয়ারাকে বলে' ভালো একখানা টঙ্গা ভাড়া করিয়ে আনালুম—টঙ্গা হাজির, বেরুবো, হঠাৎ এক ফ্যাসাদ—সামনে উপস্থিত একটা আর্দ্দালি। আর্দ্দালি বললে—ক্যাপটেন মরিশন—আমার বন্ধু—সেলাম জানিয়েছেন, এখনি যেতে হবে জরুরি দরকার। দু-নম্বর ব্যারাকের এক চৌকিদারের সঙ্গে আমাদের ব্যারাকের এক চৌকিদারের ভয়ানক লাঠালাঠি হয়ে গেছে। দুটোই জাতে পাঠান—মদ খেয়ে দাঙ্গা—উপলক্ষ্য শহরের একটা কুমারী। লাঠির ঘায়ে একজনের মাথা ফেটে অজ্ঞান আর একজনের নাকটা গেছে ভেঙে। কর্ণেল সাহেব ব্যারাকে নেই—এ ব্যারাকে আমি আজ চীফ-ইন-ডিউটি—আমার গিয়ে তদন্ত করতে হবে!

রাগ হলো—কিন্তু উপায় নেই—'ডিউটি'! মিলিটারী ডিউটি না মানলে শুধু চাকরি থেকে ডিসমিস নয়—কোর্ট মার্শাল।—অথচ মন আকুল অধীর দলিগঞ্জে যাবার জন্য। যেতে হলো মরিশনের চিঠি মেনে! ভাগ্য প্রসন্ন, কিছু করতে হলো না—কর্ণেল সাহেব এসে পড়েছেন ইতিমধ্যে—তিনি নিয়েছেন বিচার-তদন্তের ভার—নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম—বেরিয়ে এলুম ব্যারাক ছেড়ে পথে। দুগ্র্হ—টঙ্গা নেই! শুনলুম, আমার আসতে দেরি হচ্ছিল—ইতিমধ্যে ব্যারাকের আর. কে সে টঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে গেছে। একটু দূরে ছিল স্ট্যাণ্ড—দিলখুশার গায়ে। সেখানে এসে দেখি, স্ট্যাণ্ড খালি—একখানাও গাড়ী নেই! সর্ব্বনাশ! এখন ···

হাঁটতে হাঁটতে চললুম—যদি পথে চলতি গাড়ী পাই—টঙ্গা না মেলে, এক্কাই সই।

আধঘণ্টা হেঁটে চলেও গাড়ী পেলুম না! ও-আর-আর লাইন পার হয়ে হজরৎগঞ্জের রাস্তা ধরলুম—কমিশনারের বাড়ীর সামনে মিললো পচারকমের একটা টঙ্গা, তাতে চড়েই বসলুম, বললুম—চলো দলিগঞ্জ।

সে বললে পাঁচ টাকা নেবে! কুছ পরোয়া নেই! গাড়ী চললো।

মনে হলো, এ-গাড়ী সে প্রাসাদের ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে লোকজন কি পাত্তা দেবে? কিন্তু উপায় কি—ভরসার মধ্যে মিলিটারী ইউনিফর্ম্ম! 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস পড়েছিলুম, অমিয়ট না জনস্টন্, কে বলেছিল, এখনি ব্রিটিশ পদাঘাতে এদেশের সব দোর খুলে যাবে—তেমনি মনে হলো, এ পোশাক দেখে দরজা সকলে খুলে দেবে!

গুমতির পুল পার হলুম। যেন কিষ্কিন্ধ্যাপুরী—হনুমানের দল রীতিমত কলোনি গেড়ে বাস করছে!—পুলের উপর থেকে নজরে

পড়লো উত্তর-পশ্চিমে উঁচু টিলা—টিলার উপর তরুকুঞ্জ ঠেলে প্রাসাদের গম্বুজ উঠেছে মাথা তুলে—বুঝলুম, ঐ পুরী!

ফটকে এসে পৌঁছুলুম—টঙ্গা বিদায় করে ফটকে ঢুকলুম—দরোয়ান কার্ডখানা দেখবামাত্র সসম্ভ্রমে আমায় নিয়ে প্রবেশ করলো সেই পুরীতে। হাতঘড়ির পানে চেয়ে দেখি, আধঘণ্টা লেট্! মনটা ছাঁৎ করে উঠলো! ভাববে, কায়দা-কানুন জানে না—ভাবুক গে—আলাপ-পরিচয় হবে তো ...

খাবার ঘর। প্রকাণ্ড টেবিল—আমি ঘরে ঢোকবামাত্র পাঁচ জোড়া দশ জোড়া বিশ জোড়া চোখ একসঙ্গে আমার অঙ্গে যেন দৃষ্টিশর বর্ষণ করলো! এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক—দেখে মনে হলো উনিই মিস্টার চাকারবার্টি—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—কোলের ন্যাপকিনখানা রেখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন—মুখে হাসি, দৃষ্টিতে প্রীতিমাখা—একটি হাত বাড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন।

আমার মনের উপর থেকে ভারী পর্দাখানা গেল সরে'—দেরির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলুম। তিনি আমার দুখানা হাত চেপে ধরে শুধু হেসে বাঙলায় বললেন, না, না,—কোনো ত্রুটি হয়নি। বুঝি তো, মিলিটারীর চাকরি—কখন কোথায় কি ডিউটি পড়ে। বসো—ভালো কথা, তুমি আমার ছেলের বয়সী—তোমাকে আপনি, মশাই বলতে পারবো না, তা সে যতবড় মিলিটারী অফিসারই হও না কেন—তার ওপর আমরা হলুম বাঙালী।

হাত ধরে' তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের আগে তাঁর মেয়ের সঙ্গে! বয়সে কিশোরী—লতার মতো পল্লব-দেহ। মেয়েটি পাশের বান্ধবীর সঙ্গে কথা কইছিলেন—বাপের কথায় আমার পানে তাকালেন—ডাগর দুটি চোখে স্মিত সলজ্জ দৃষ্টি!

মিস্টার চাকারবার্টি বললেন, ইনি লেফটেনাণ্ট কিরণ গাঙ্গুলি—আমার মেয়ে এনা—এটি আমার ভাইঝি মীরা।

টেবিলে বসে চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলুম—না, আমাদের আর্মির কোনো লোক আসেনি—কোনো অফিসার পর্য্যন্ত নয়! কাকেও চিনি না, জানি না—চারিদিকে অজানা মুখ! এঁদের মধ্যে কেউ এখানকার তালুকদার, কেউ সরকারী কর্মচারী, কেউ ব্যারিস্টার, উকিল, সকলেই এসেছেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে চায়ের এই আসরে। এ সভায় আমি ঠিক হংসমধ্যে বকো যথা—একেবারে খাপছাড়া। আমার সৌভাগ্য যে, আমার আসন ছিল মিস্টার চাকারবার্টির ভাইঝি রূপসী মীরা দেবীর পাশে। আমার সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে কথা বলছিলেন। পরনে তাঁর হাফহাতা গরম ব্লাউজ ফোলা হাত—রঙ পাকা—ছিটের মতো কোমল, মসৃণ! আমার বাঁ দিকে আর একজন কিশোরী—মুসলিম রূপসী মনে হলো—কথায় এদেশী টান—কিন্তু তিনি কথা বলছিলেন হিন্দীতে ইংরেজীতে মিশিয়ে।

আমার মনে হচ্ছিল, আমি স্বপ্ন দেখছি বুঝি! এত বড় প্রাসাদ, এমন সাজানো ঘর, এমন সব আসবাবপত্র, এমন খাবার আর এই রূপসীর মেলা আর এই সমাদর! সামন্তুলের কথা এতটুকু অত্যুক্তি নয়—এমন সমাদর আত্মীয় বন্ধুরাও করে না।

খাওয়া চুকলে আমরা আর একটা ঘরে এসে বসলুম। প্রকাণ্ড ঘর—বেলোয়াড়ি কটা বড় ঝাড়ে ইনক্যাণ্ডিসেণ্ট গ্যাসের অজস্র বাতি জ্বলছে, পিয়ানোর ধারে বসে মীরা দেবী। একটা সোফায় অর্দ্ধশায়িতভাবে বসেছেন এনা দেবী—তাঁর বুক থেকে পা পর্য্যন্ত নক্সাদার একখানা জামিয়ার ঢাকা। হাত চললো—নিমেষে সুরের ঝরনা ঝরলো—সে সুরে আমার মন চললো বাস্তব ভুলে কোন মায়ালোকে!

তারপর যখন সম্বিত ফিরলো, দেখি, অতিথিরা একে একে চলে যাচ্ছেন। আমাকেও উঠতে হলো—আটটা বাজছে।

এনা দেবী বললেন—সকলে একসঙ্গে চললেন—আপনি আর একটু বসবেন না? আলাপ হলো না—কথা হলো না।

মনের মধ্যে যেন মেঘ ডাকলো—তেমনি গুরগুর গর্জ্জন! ভাবলুম আমার মনও এই কথা বলছে! কিন্তু উঠে পড়েছি বসা ভালো দেখাবে না! বললুম নটার মধ্যে আমাদের ব্যারাকে ঢুকতে হবে—অনেকখানি পথ—

এনা দেবী বললেন—আমাদের মোটরে করেই না হয় যেতেন—

মুখে কথা ফুটলো না—মনের মধ্যে কে যেন ভৎর্সনার সুরে বার-বার বলতে লাগলো, বেকুব—বেকুব—হাতের নাগালে পেয়ে স্বর্গ ছেড়ে চলেছিস!

মিস্টার চাকারবার্টি বললেন—ওঁকে কেন একথা বলে অপ্রতিভ করো মা, মিলিটারী সার্ভিস—বেশিক্ষণ থাকতে হলে হয়তো অফিসারের কাছ থেকে ছুটি নেওয়া দরকার। বেশ তো—আর একদিন ওঁকে নেমন্তন্ন করো—স্পেশালভাবে।

এনা দেবীর একাগ্র দৃষ্টি আমার উপরে নিবদ্ধ—তিনি বললেন, আসবেন আর একদিন—এই আসাই যেন শেষ আসা না হয়।

অভিভূতের মতো বললুম—আসবো।

—কবে? বলুন না, বলে যান।

মনে হলো বলি কালই—কিন্তু তা বলতে পারলুম না বড় বিশ্রী শোনাবে। বললুম—আজ রবিবার, সামনের বুধবারে।

—বেশ তাহলে নেমন্তন্ন রইলো। বুধবার বিকেলে আসবেন, এখানে চা খাবেন এবং রাত্রে ডিনার খেয়ে তারপর ব্যারাকে ফিরবেন—গান বাজনা হবে মেলামেশা—ছুটি নিয়ে আসবেন।

—আসবো।

—চিঠি লিখে মনে করিয়ে দিতে হবে ?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললুম—না, না—কথা দিয়ে যাচ্ছি—পাকা কথা—

মিস্টার চাকারবার্টি বললেন—গুড্ নাইট, এসো বাবা—কয়াশ্জী যাবে তোমাদের ব্যারাকের কাছাকাছি—দিলখুশার পাশে বাড়ী—ওর গাড়ীতে তুমি যাবে, আমি বলে রেখেছি।

এ কথার পর আর দাঁড়ানো চলে না—এগুতে হলো মিস্টার চাকারবার্টির সঙ্গে।

এনা দেবী বললেন—আসবেন ঠিক বুধবার—

ফিরে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললুম—আসবো।

—গুড্নাইট লেফটেনাণ্ট ···

—গুড নাইট।

৩

সে রাত্রিটুকু—প্রথম যৌবনে রূপের প্রথম স্বপ্ন …

আজ প্রায় ত্রিশ বছর পরে সেই রাত্রির কথা মনে হলে মন কী টোর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়! যেচে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে' যে ল করেছিলুম সে রাত্রে, হয়তো ছোট্ট ভুল—কিন্তু সে ভুলের স্মৃতি াকলের মতো আমার সমস্ত জীবনটাকে কষে বেঁধে ব্যর্থ করে দিয়ে ানির পঙ্কে জীবনকে কালিমা-জর্জ্জরিত করেছে! কিন্তু সে ভুল ঘটেছিল ামার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে …

থাক—সে সব কথা ক্রমশ প্রকাশ্য।

সে রাত্রিটা কেটেছিল ঘুমে-জাগরণে—স্বপ্ন আর ক... তুলির লখায়। কেবলি মনে হচ্ছিল, বুধবার—বুধবার—মাঝখানে ...মবার এবং মঙ্গলবার দুটো দিন, দুটো রাত্রি, বুধবারেও সারা দিনটা।

হঠাৎ কে যেন মারলো মনে প্রশ্নের খোঁচা—বেশ বুধবার যেন যাবে, কিন্তু কিসের লোভে?—কি বা লাভ হবে, ভাবছ?—সে খোঁচা ...দিকে খেয়াল ছিল না তখন।

কখন ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না। যখন ঘুম ভাঙ্গলো ঘরে রোদ এসেছে, পাশের সঙ্গীদের বিছানা খালি। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে পোশাক পরে' ছুটলুম খাবার ঘরে। সঙ্গীরা নানা প্রশ্ন করলো—কোথায় গিয়েছিলে, অত রাতে ফিরলে!—কেউ বললে একখানা মোটরে করে' ফিরলে কোন্ রইস আদমীকে পাকড়াও করলে হে?

জবাব দিলুম না। চায়ের পর্ব্ব সেরে কুচ-কাওয়াজ—তারপর বেলা

দশটায় মাথায় জাগলো আইডিয়া—সাইকেলে করে' চলে গেলুম সোজা সামগুলের স্টোর্সে।

সামগুল বললে—গুড মর্নিং—

চায়ের আসরের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে সেরে টাটকা তাজা রকমারি ফুলের অর্ডার দিলুম—সব-সে সেরা ফুল! সামগুল দিলে তার ফুলের ডিপার্টমেণ্ট থেকে টাটকা তাজা একরাশ বস্‌রাই গোলাপ—আমীর ওমরাহরা বেছে যেমন কেনে, তেমনি ফুল।

সামগুল বললে—মিস্টার চাকারবার্টির বাড়ীর জন্য?

প্রশ্নটা পড়লো মনের উপর চাবুকের মতো। কোনোমতে সলজ্জ কণ্ঠে বললুম—হুঁ, কাল যে আদরে আপ্যায়িত করেছেন—কৃতজ্ঞতা নিবেদন—

—হুঁ—সামগুল সাজি সাজিয়ে দিল।

আমি বললুম—দাম?

সামগুল এ্যাসিস্টাণ্টকে বললে—বিল আনো।

বিল এলো—দেখে শিউরে উঠলুম—সে মাসের মাহিনার যা-কিছু বাকি ছিল বাকি দিনগুলোর সম্বল—ফুলের দাম দিতে তার সব গেল বেরিয়ে। নিঃস্ব হলুম—যার মানে, কপর্দ্দকহীন। মনে হলো, ভয় কি—বন্ধুবান্ধব আছে, ধার মিলবে তো!

সামগুল বললে—কিছু লিখে দেবে!

নামের কার্ড দিলুম সাজিতে এঁটে। কার্ডে লিখলুম বেশ সুস্পষ্ট বাঙলা হরফে—কিরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন—

সামগুল বললে—কাকে এ নিবেদন?

বললুম—মিস্টার চাকারবার্টির নাম দেবো?

—ফুল্! বলে' সামগুল হাসলো, বললে—যারা ফুল্ হয় তারা ফুল দেয় পুরুষ মানুষকে—বিশেষ, ঐ বয়সের পুরুষমানুষকে!

বুকখানা টিপ্‌টিপ্‌ করছিল। বুকের বাসনাটুকু বুঝি বুকের কপাট ঠেলে সবেগে বেরিয়ে আসে। হয়তো বলে ফেলতুম, কিন্তু তার আগেই সামন্তলই নিজে থেকে বললে দুই মিসিবাবার নামে পাঠাও বন্ধু—ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিসটি যাবে তাহলে।

চলে গেল আমার অন্তরের নিবেদন, প্রাপ্তি-সংবাদ মিললো বেলা দুটোয়। চাকারবার্টির উর্দ্দীপরা বেয়ারা নিয়ে এলো চিঠি।

বাঙলায় লেখা চিঠি—ছোট্ট চিঠি—চিঠিতে লেখা,

লেফটেনান্ট সাহেব,

বহু ধন্যবাদ। বুধবারের কথা মনে করিয়ে দিলুম।

এনা মীরা

মঙ্গলবার। মন কিছুতে স্বস্তি পায় না—ডিউটির রুটিন কোনোমতে সেরে নিয়ে বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়লুম ব্যারাক ছেড়ে। দু-চারজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা—তারা বললে—চলো, লাটুশ রোডের সিনেমা হাউসে নতুন ছবি এসেছে—টার্জান্‌ ···

আমি বললুম—না, আমাকে যেতে হবে হজরৎগঞ্জে—এক আত্মীয় করেছেন নিমন্ত্রণ।

তাদের পাশ কাটিয়ে চললুম সোজা উত্তর দিকে। কোথায় যাবো কিছুই ঠিক করিনি—মনের সঙ্গে নিজের সংযোগ যেন গেছে কেটে—পা দুখানা চলেছে যেন নিজের খেয়ালে!

চলেছি—চলেছি—চলেছি—পুরোনো যুগের সমাধি-স্তম্ভ—মসজিদ মিনার দোকানপাট চোখের সামনে দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে ছায়াছবির মতো!

হঠাৎ যখন মনের দেখা পেলুম, চমকে উঠলাম, এ কি, এ যে সোজা

দলিগঞ্জে চলে এসেছি। লোকে বিশ্বাস করবে না—কিন্তু আমি মিথ্যা বলছি না—এদিকে আসবো বলে' সঙ্কল্প করিনি। কাল এখানে আছে নেমন্তন্ন—তার আগে এলে যে আমায় ভিখারীর অধম বলবে, এ জ্ঞানটুকু সত্যই হারাইনি! এসে মনে হলো, তাইতো, ওঁরা কত কাজের মানুষ—নিত্য নতুন নতুন অতিথি সমাবেশ হয় ওঁদের ওখানে—আর না বলে, না জানিয়ে আমি হঠাৎ…? কি কৈফিয়ৎ দেবো? ফিরে যাই বরং।

কিন্তু ফেরবার উপায়ও ছিল না। কারণ মন তখন বেশ রুখে উঠে পা দুখানাকে দিচ্ছে মোচড়! ঢুকলুম ফটকে—সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে সামনে এসে দাঁড়ালেন মীরা দেবী।

হাসিমুখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মীরা দেবী বলে উঠলেন—এ কি আপনি—লেফটেনাণ্ট গাঙ্গুলি! বাঃ!

অভ্যর্থনা করে' আমাকে নিয়ে বসালো সেই সজ্জিত ঘরায়। ঘরের ও-কোণে সবুজ রঙের একটা টেবিলের ধারে বসে এনা দেবী—কোলের উপর থেকে বড় একটা ব্লাশের র‍্যাগ ঝুলানো একেবারে পায়ের নীচে পর্যন্ত—কেউ তাঁর পা দেখতে পাবে না—এমনি ধরনের ব্যবস্থা যেন!

আমায় দেখে স্মিতহাস্যে মাথা নেড়ে এনা জানালেন অভিবাদন! আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম—যেন স্ট্যাচু! আমার মুখে কথা নেই—তাঁরো মুখে নয়। দৃষ্টি পরস্পরের উপর নিবদ্ধ।

এ স্তব্ধতা ভাঙ্গলেন মীরা দেবী। সচকিত কণ্ঠে মীরা দেবী বললেন—আপনাকে কি দেবো বলুন লেফটেনাণ্ট গাঙ্গুলি—চা না কফি! না কোকো? না অন্য কোনো—

জবাব দিলুম,—যা আপনার অভিরুচি!

মীরা দেবী বললেন—না, না—আপনি যা ভালো বাসেন। লজ্জা বা লৌকিকতা করবেন না আমাদের এখানে—আমরা সবাই বাঙালী—আপন জন।

খুশিতে মন ভরে' গেল। মৃদু হাস্যে বললুম—তাহলে কফিই দিন।

—বেশ! মীরা দেবী চলে গেলেন।

আমি তখনো দাঁড়িয়ে—এনা দেবী বললেন—এদিকে আসুন, বসুন।

একটু আশ্চর্য বোধ করলুম। ঘরের এদিকে সোফা-কৌচ অথচ এনা দেবী বসে আছেন একেবারে সেই কোণে—এদিকে না এসে আমাকে ঐ কোণে গিয়ে বসতে বলছেন।

কিন্তু প্রশ্ন করা চলে না—আমি গেলুম তাঁর কাছে। টেবিলে বেল ছিল—এনা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দিপরা বেয়ারার প্রবেশ। এনা দেবী বললেন—আরাম কুর্শী।

হাইব্যাক একখানা চেয়ার এনে বেয়ারা রাখলো এনা দেবীর সামনে—রেখে বেয়ারার প্রস্থান। এনা দেবী বললেন—বসুন।

বসলুম। এনা দেবী বললেন—এদিকে এসেছিলেন বুঝি?

ঢোঁক গিলে জবাব দিলুম—হুঁ, আমাদের দলের এক বন্ধুর আত্মীয়ের বাড়ী এদিকে, সেখানে এসেছিলুম বন্ধুর সঙ্গে। ফেরবার সময় মনে হলো ···

হেসে এনা দেবী বললেন—[illegible] কাল আসতে যেন ভুল না হয়। আজ এসে সে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট কাটিয়ে যাচ্ছেন না তো!

—না, না, না—এটা জুলুম করতে আসা—হোয়েন নট্ এক্সপেক্টেড—পারহাপস্ নট ওয়াণ্টেড টু ···

এনা দেবীর মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। তিনি বললেন—তা নয়। যাঁরা বন্ধু, মানুষ সব সময় তাঁদের প্রত্যাশা করে—সব সময়েই তাঁদের চায়।

বুকের মধ্যে যেন একটা পাখী ডানা ঝটপটিয়ে উঠলো। বন্ধু—বন্ধু। তারপর কারো মুখে কথা নেই! খোলা খড়খড়ির আধখোলা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, ওদিকের পুষ্প-কানন—লনে যেন রকমারি মরসুমী ফুলে রচা গালচে পাতা—গোধূলির ছায়া একটু একটু করে' নেমে বাগানখানিকে স্বপ্নময়তায় ভরিয়ে তুলেছে যেন! মনে হলো এসময়ে অমন চমৎকার বাগানে না বসে, না বেড়িয়ে ঘরের কোণে এমন করে ব্লাশের র‍্যাগ অঙ্গে টেনে বসে আছেন! হয়তো শরীর অসুস্থ! তা যদি হয়, জুলুম করছি না তো? এই ভেবে সবিনয়ে প্রশ্ন করলুম—আপনার কি শরীর অসুস্থ?

—কেন বলুন দিকিনি ••• একথা জিজ্ঞাসা করছেন? আমায় দেখে—

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ভালো করে' তাঁর মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আমি বললুম—এ রকম র‍্যাগ-চাপা দিয়ে বসে আছেন—এ-সময়ে •••

কথাটায় কি ছিল জানি না। এ কথা শোনবামাত্র তাঁর মুখের সে হাসির দীপ্তি নিবে গেল ••• নিমেষে ফুটলো মুখে মলিন ছায়া। একটা নিশ্বাস ফেলে মাথাখানা চেয়ারে হেলিয়ে দিয়ে তিনি মুখ ফেরালেন।

আমার বিস্ময়ের সীমা নেই! শরীর অসুস্থ তাহলে ••• কিন্তু সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন করার দরুন •••

ঘরে ঢুকলেন মীরা দেবী—পিছনে বয়। বয়ের হাতে ট্রে—ট্রেতে কফিপট, পেয়ালা, পিরীচ, পেষ্ট্রি, বাদাম, পেস্তা, আঙুর, কমলালেবু আপেল প্রভৃতি •••

টেবিলে ট্রে রেখে বয় চলে গেল। মীরা দেবী চাইলেন আমার পানে, বললেন আমি তৈরি করে দেবো? না, আপনি নিজে •••

—যখন এতখানি অনুগ্রহ করলেন, তখন এটুকুও •••

মৃদু হেসে পট্টা ধরে' মীরা দেবী চাইলেন এনার পানে, চেয়েই পট্

বেগে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে ... তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন—কি হলো রে এনা ?

এনা দেবীর মুখে কথা নেই—মীরার পানে তাকালেনও না। মীরা দেবী তাকালেন আমার পানে—ত্'চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

আমি কি জবাব দেবো ? চুপ করে' রইলুম।

সস্নেহে এনার মুখ এদিকে ফিরিয়ে মীরা দেবী আবার প্রশ্ন করলেন, —কি হয়েছে—এঁ্যা ?

চাইলুম এনা দেবীর পানে—ত্রুটি গাল গোলাপের মতো রাঙা, ঠোঁট কাগজের মতো সাদা, চোখের সে দীপ্তি গেছে মুছে—ত্'চোখে জলের ধারা! যেন দারুণ বেদনায় তিনি আর্ত্ত! আমার ও প্রশ্নে এমন বিপর্য্যয়! ব্যাপার কি ? মীরার পানে চাইলুম—মীরা চাইলেন আমার পানে ... তাঁর চোখে কি যেন ইঙ্গিত ... কিসের ইঙ্গিত, বুঝলুম না। হঠাৎ মীরা দেবী বললেন—মুখ হাত ধোবেন আস্থন—বাথ-রুমে ...

এ কথা বলে' তিনি চললেন এগিয়ে ... আমি চললুম তাঁর পিছনে। ঘরের বাহিরে আসবামাত্র মীরা দেবী থমকে দাঁড়ালেন—মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কোনো কথা হয়েছিল আপনাদের এর মধ্যে ?

বললুম মীরা দেবীকে ... এমন সময়ে র‍্যাগে গা ঢেকে ঘরে বসে আছেন দেখে সেই ছোট্ট প্রশ্নটির কথা।

শুনে মীরার চোখে যেন বিদ্যুৎ ছুটলো! মীরা দেবী বললেন—অন্যায় করেছেন !—কিন্তু আপনার দোষ নেই আপনি তো জানেন না ...

—কি ?—সভয়ে প্রশ্ন করলুম।

মীরা দেবী বললেন—ওর ত্রুখানি পা সম্পূর্ণ অবশ—ক্রাচ্ না হলে এনা ত্'পা এগুতে পারে না। আপনার ওকথায় সেই ইঙ্গিত পেয়েই ও ...

কথা মীরা শেষ করলেন না। না করলেও যেটুকু বললেন, তা থেকে আমার আর বোঝবার কিছু বাকী রইলো না।

বাথ-রুম নির্দেশ করে মীরা দেবী বললেন—আপনি মুখহাত ধুয়ে আসুন—আমি গিয়ে ওকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করি ···

একথা বলে' মীরা দেবী গেলেন চলে ··· আমিও বাথরুমে ঢুকলুম।

ঘরে ফিরে আসবামাত্র এনা দেবী কথা কয়ে আমার বুকের পাথর-খানা দিলেন সরিয়ে। বেশ সহজ কণ্ঠেই তিনি বললেন—কোমরের তলোয়ারখানা খুলে আরাম করে' বসুন।···

তলোয়ার রেখে আরাম করে বসলুম। মীরা দেবী পেয়ালায় কফি ঢাললেন ··· এনা দেবী বললেন—সত্যি, খুব চমৎকার ফুল পাঠিয়েছিলেন কাল। ঐ দেখুন, আমার শখের ফুলদানিতে আপনার সে ফুল রেখেছি, আজো বেশ তাজা আছে! চমৎকার!

তার পর কফির টেবিলে নানা কথা নানা গল্প! মীরা দেবীর গানের সুখ্যাতি করে এনা দেবীকে বললুম—আপনার কাছে আমার একটি দাবি আছে! যদি অনুমতি করেন!

—দাবি!—এনা দেবীর প্রশ্নে যেমন কৌতূহল ··· তেমন বিস্ময়!

আমি বললুম—সেদিন আপনার হাতের বেহালা শুনলুম, এখন গান শুনতে চাই!

—গান!—এইটুকু বলে এনা দেবী চুপ করে রইলেন।

মীরা বললেন—এনা খুব কালোয়াতি গান গায়, বড় বড় ওস্তাদদের কাছে শেখা ··· আমি গাই চুটকি!

বাধা দিয়ে বললুম—নিজেকে খেলো করছেন কেন! সে রাত্রে যা গেয়েছিলেন তাকে চুটকি বলেন! রবীন্দ্রনাথের গান ···

মীরা দেবী বললেন—এখানকার ওস্তাদরা বাঙলা গানকে আমোল

দেন না মোটে—রবীন্দ্রনাথের গান শুনে ওরা হাসেন, বলেন—খেলো! অথচ রবীন্দ্রনাথ খেয়াল ধ্রুপদ লিখেছেন ···

—নিশ্চয় ! আমি বললুম—এই দেখুন না এ দুখানা গান ···

হে মহাপ্রবল বলী,
কত অসংখ্য গ্রহতারা তপনচন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু,
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য। ···

তারপর

প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কী দুর্দিন—
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনিতর্জন।

তারপর

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগতমন্দিরে।

এ কথাগুলো বলবার সময় আমার কণ্ঠে অনেকখানি আবেগের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে সুরের একটু রেশ ঝরে পড়েছিল ··· নিশ্চয় সেটুকু লক্ষ্য করে' এনা দেবী স্মিতকণ্ঠে বললেন—আপনি ভালো গান গাইতে পারেন, না ?

—কে বললে ? নিতান্ত অপ্রতিভভাবে এ প্রশ্নটা নিক্ষেপ করে' আমি দুজনের পানেই চাইলুম—দেখি, দুজনের চোখে বিস্ময়ের দীপ্তি !

মীরা দেবী বললেন—গানের লাইনগুলো নাহলে অমন সুর-লয়ে বলতে পারতেন না, লেফটেনান্ট গাঙ্গুলি !

অস্বীকার করতে পারলুম না—সে ইচ্ছাও ছিল না ! ভাবলুম, এই গানকে অবলম্বন করেই এঁদের সঙ্গে হৃদ্যতা নিবিড় করে যদি

তোলা [redacted]। বললুম, একটু-আধটু চর্চা করেছি এককালে! তাও ওস্তাদদের কাছে নয়, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের গান ভালো গাইতে পারেন, তাঁদের সাহায্যে।

এনা দেবী বললেন—কফি শেষ করে' শোনাবেন একখানি?

মীরা দেবী মহা উৎসাহে বললেন—অর্গান চান, অর্গান আছে পিয়ানো বলুন, পিয়ানো …

বললুম—বাজনায় তেমন হাত নেই—ওদিকটার ভার যদি আপনারা নেন।

হুঁ—বলে' মীরা দেবী আশ্বাস দিলেন—আমি অর্গান বাজাবো আর এনা নেবে বেহালা …

হেসে আমি জবাব দিলুম—কিন্তু তার আগে কথা দিন, হাসবেন না আমার গান শুনে!

মীরা দেবী বললেন—বেশ, খুব একখানা করুণ গান ধরুন—হাসির কোনো সম্ভাবনা থাকবে না তাহলে …

যে কথা, সেই কাজ! এনা দেবীর হাতে বেহালা তুলে দিয়ে মীরা দেবী বসলেন অর্গানের সামনে।

আমি বিপদে পড়লুম—কি গান গাইব? কটাই বা তেমন জানি! স্মৃতির পুঁজি হাতড়াতে লাগলুম … মীরা দেবী অর্গান টিপছেন—এনা দেবী একাগ্র দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে, অপলক দৃষ্টি! সে দৃষ্টিতে আমি কি দেখলুম, মনে নেই—শুধু মনে আছে, আমি গান ধরলুম …

তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুদূর,
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগনবিহারী …

বোধ হয় ভালই গেয়েছিলুম। গান থামলে ওঁদের দুই বোনের পানে চেয়ে দেখি, দৃষ্টিতে কেমন যেন বিহ্বল ভাব!

বললুম—হাসচেন তো খুব মনে মনে।

মীরা দেবী বললেন—এমন গুণ ঢেকে রেখে মিলিটারী ইউনিফর্মে ··· স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, লেফটেনাণ্ট গাঙ্গুলি।

কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলুম, দেওয়া হলো না—ঘরে ঢুকলেন মিস্টার চাকারবার্টি! ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন—তুমি গান গাইছিলে লেফটেনাণ্ট?

লজ্জায় আমি মাথা নামালম। এনা দেবী বললেন—সত্যি কি চমৎকার ··· নয় বাবা?

—হুঁ ··· বেশ ··· বেশ ··· এরা গান-বাজনা ভালোবাসে। রবীন্দ্রনাথ গাইলে তুমি ··· এখানে এ-সব গান কার কাছেই-বা শিখবে! আমার ইচ্ছা ··· শেখে! অতুলপ্রসাদ সেন থাকেন লক্ষ্ণৌয়ে, তা তিনি চমৎকার গান গান ··· একবার তাঁকে সাধ্যসাধনা করে' আমার এখানে এনেছিলুম ··· দুখানি গানও গেয়েছিলেন। এদের দুই বোনের হিন্দী গান শুনে তারিফও করেছিলেন খুব। মিস্টার সেন বলেছিলেন, বাঙালীর মেয়ে ··· এমন গলা ··· তোমাদের উচিত বাঙলা গান শেখা ··· আর কোনো গান না শেখেন রবীন্দ্রনাথের ক'খানা চয়েস গান অন্তত!

তিনি বসলেন, বললেন—তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়নি সেদিন ··· আজ ভিড় নেই, একটু আলাপ করা যাক।

তারপর হাজার প্রশ্ন ··· বাড়ী কোথায়? বাড়ীতে কে কে আছেন? থেকে শুরু করে এদেশে কতদিন আছি ··· মিলিটারী চাকরি আমার পছন্দ কি না ··· রেজিমেণ্টের অমুক লেফটনাণ্টকে চিনি কি না

কানপুরে এলাহাবাদে, মানে, পশ্চিমাঞ্চলে কোথায় কোথায় গেছি প্রভৃতি। এমনি প্রশ্নোত্তরে আমাদের কথাবার্তা সহজ হয়ে এলো। মস্ত আমীর লোক বলে' আমার মনে যে সঙ্কোচ, যে সন্দেহ ছিল তাও কুয়াশার মতো কেটে কেটে মন অনেকখানি ফরসা হলো।

কথায় কথায় মিস্টার চাকারবার্টি বললেন—তোমাকে বলতে পারছি না তোমার সময় কোথায় ··· তবু বলবার জন্ম মন আমার ···

আমি সাগ্রহে বললুম—না, না, বলুন আপনি যা বলতে চান।

মিস্টার চাকারবার্টি বললেন—আমার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ··· কিন্তু সুযোগ মেলে না ··· মানে, এরা বাঙলা গান শিখুক। বাঙালী হয়ে বাঙলা গানের ঐশ্বর্য জানবে না ··· তা, তোমার যদি অসুবিধা না হয়, মানে, say দুদিন যদি আমার মতো এদের একটু ···

মন আমার মাতাল হয়ে উঠলো যেন! বললুম—শেখাবার মতো বিদ্যে আমার নেই ··· এঁদের কাছে আমি বহুকাল ধরে বরং শিখতে পারি ··· তবু ··· অর্থাৎ আমার জানা গান শোনাতে পারি ··· যদি সুরে তালে গোল না থাকে, এঁরা অনায়াসে তা থেকে—

—ব্যস ··· ব্যস ··· ব্যস—মিস্টার চাকারবার্টি বললেন—আমি কৃতার্থ হবো! মানে—

কথা শেষ হলো না ··· দোরের ভারী পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো জোয়ান এক পশ্চিমী বেয়ারা ··· রবার-টায়ার চাকা লাগানো একখানা চেয়ার ঠেলে। ভূত দেখলে মানুষের মুখের যেমন ভাব হয় তার পানে চেয়ে এঁদের তিনজনের মনের ভাব হলো ঠিক তেমনি ···

মিস্টার চাকারবার্টি বললেন—সবুর করো 'রৌসান, সা'ব এখনি যাবেন ··· উনি গেলে পরে ···

সঙ্গে সঙ্গে আমার পানে চেয়ে বললেন—সন্ধ্যা হয়ে এলো, তোমায়

ধরে রাখবো না!… আমার গাড়ী বলে' দিচ্ছি … এসো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে গাড়ী একেবারে তোমার আস্তানায়…

সঙ্কোচভরে বললুম—কোনো দরকার নেই। বেরিয়ে একখানা টাঙ্গা করে নেবো।

না, না … টাঙ্গা কেন … ঘরের গাড়ী থাকতে!… তাছাড়া এদেশে টাঙ্গা বড় একটা পাওয়া যায় না।

যেতে হলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও: এনা মীরা বললেন—কাল বুধবার, মনে থাকে যেন।

৪

পরের দিন সকালে বন্ধুবান্ধবের হাস্য-পরিহাস যে ভাবে বর্ষিত হলো … অতবড় মোটর গাড়ী করে' এসে ব্যারাকের ফটকে নেমেছি… তারা সে মোটরের স্বপ্নও দেখে না … তাদের কৌতুক প্রশ্নের বিরাম নেই … কৌতূহলেরও সীমা নেই।

—কি হে, কি করে' হঠাৎ এমন শাঁসালো মক্কেল পাকড়ালে? … কে হে ম্যাটার্স ম্যাট্রিমোনিয়াল না কি? … আর একদিন রাত করে ফিরেছিলে … চুলের টিকি দেখিনি বিকেল থেকে … সেদিনও ঐখানে না কি? ইত্যাদি …

এ-সব প্রশ্নে আমার মনকে বেশ খানিকটা নাড়া দিলে … এবং সে নাড়ায় আমার আত্মবিশ্বাসেও চিড় খেয়ে ছিল!… কারণ চাকারধাটি পরিবারের সঙ্গে মেলা-মেশায় নিজের কাছে আমার মর্যাদা আর সম্ভ্রম যেন অনেকখানি বেড়ে উঠেছিল … এ ব্যাপারে আমি প্রথম উপলব্ধি করলুম, আমি যেন গরীব গৃহস্থের ছেলে, তুচ্ছ নগণ্য জীব নই … আমার মধ্যে কিছু পদার্থ আছে। এরা কৌতুক করছে … ভেবেছে আমি দীনদরিদ্র ব্যক্তি সেখানে যাই ভিক্ষুকের মতো প্রসাদপ্রার্থী হয়ে … বোঝে না, আমাকে ওঁরা নিজেদের সমপদ ব্যক্তির মতো … বন্ধুর মতো মনে করে। তাদের কথা গায়ে মাখলুম না … কোন জবাবও দিলুম না … বেচারীর দল! এরা স্বপ্নেও যা ভাবতে পারে না আমার ভাগ্যে তার অনেক বেশি …

ওদের ও হাস্য কৌতুকে আমার মনে নানা প্রশ্ন, না না দ্বিধার

উদয় হলো। নিজের মনকে প্রশ্ন করলুম—কেন ওখানে গিয়েছিলুম? অযাচিতভাবে কাল গেলুম কেন? কেন? সামান্য লেফটনাণ্ট ··· যুদ্ধের দৌলতে এমন সাজ-পোশাক এঁটে দুপয়সা রোজগার করছি ··· এযুদ্ধ ফুরোলে বেকার হয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াবো ··· তাছাড়া চাকরি করতে করতে কবে এখান থেকে আর কোনখানে যাবো বদলি হয়ে ··· তখন এঁদের সঙ্গে দেখা হওয়া দূরের কথা ··· আমার কোনো খোঁজ খবরও এঁরা নেবেন না।··· আজ বুধবার ··· নিমন্ত্রণ করেছেন! বাঙালী বলে, ··· বিদেশে আত্মীয় বন্ধুদের ছেড়ে বিদেশে বাড়ী আছে বলে খানিকটা মমতা—অনেকখানি অমায়িক ভদ্রতা ··· এর বেশি কি বা কারণ থাকতে পারে। এমনি নানা প্রশ্ন মৌমাছির গুঞ্জনরবের মতো মনে রণিত হতে লাগলো। এর উপর কাল মিস্টার চাকারবর্টি আমাকে চমৎকার একটি সিগারেট কেস উপহার দিয়েছেন।

মন বললে—শুধুই অমায়িক ভদ্রতা? তাহলে সিগারেট কেস দেবার কি প্রয়োজন ছিল? করুণা? ভিক্ষা? মন বলে উঠলো—না, না, না—যাই হোক, এ বন্ধনের কোনো অর্থ হয় না। কি আমি প্রত্যাশা করতে পারি ওঁদের কাছে? না, না ··· ধনীর সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে! আমি মৃন্ময়পাত্র, কাংসপাত্রের সঙ্গে মেলামেশা করতে গেলে আমাকে একদিন চূর্ণবিচূর্ণ হতে হবে!··· না, আজ ওবাড়ীতে যাবো না! কোন দিনই আর যাবো না!

মনকে কঠিন সুদৃঢ় রেখে ডিউটি সারলুম ··· বেলা তিনটায় মিললো ছুটি। নিজের কামরায় এলুম ··· দেওয়ালে ঘড়ির পানে তাকালুম ··· মিনিটের কাঁটা যেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটে এগিয়ে চলেছে ··· চারটে বাজতে আর দশ মিনিট বাকী ··· মনে পড়লো, সাড়ে চারটায় ওখানে চায়ের আসর ··· মন হলো চঞ্চল! না গেলে অভদ্রতা হবে ··· তাঁরা

আশাকরে বসে থাকবেন ··· তাঁরা তো কোন অপরাধ করেননি ··· হঠাৎ তাঁদের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা !··· তাঁদের অপমান করা হবে ! ··· আজ যাই ··· এর পর থেকে আর না হয় ··· চিঠি লিখে জানানো উচিত ছিল, বিশেষ কাজে আটকে পড়েছি ··· ডিউটি ··· তাই যাওয়া হলো না ··· ক্ষমা করবেন ! ··· তা যখন লিখিনি ···

পোশাক পরে ব্যারাক থেকে বেরলুম। সামনে দেখা সিন্‌হার সঙ্গে। সিন্‌হা বাঙালী ··· কলকাতা থেকে এসেছে। ফুর্তিবাজ বেপরোয়া তার স্বভাব। আমাকে দেখবামাত্র আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—এই যে গাঙ্গুলী, এসো, ভয়ানক দরকার।

আমি বললুম—কিন্তু আমার চায়ের নেমন্তন্ন ··· বহুদূরে—শহরের ওদিকে।

সিন্‌হা হো হো করে হেসে উঠলো, বললে—পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ী ! চায়ের নেমন্তন্ন ! নাকচ করে' দাও বন্ধু ··· তোমাকে আমার চাই ··· ছাড়ছি না। কথাটা বলে জোরে সে আমার হাতখানা ধরলো চেপে—পথে দাঁড়িয়ে ধস্তাধস্তি চলে না ··· বললুম—কিন্তু ভাই, বুঝছো না—

সিন্‌হা বললে—খুব বুঝচি ··· ফিঁয়াসের নেমন্তন্ন নয় তো—সব ফ্রেণ্ডস ··· আর মিলিটারী ডিউটি ··· কাল একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়ো, আমি নিজে তোমার সে চিঠি ক্যারি করে নিয়ে যাবো। এসো··· ডার্লিং ডিয়ার ···

কথা শেষ করে হ্যাঁচকা টান ···

সিন্‌হার টান—সে যে কতখানি অমোঘ, অব্যর্থ আমাদের দলের কারো তা অজানা ছিল না ! তার টানে এথিক্‌সের অনুরাগী ছাত্র মুকুন্দিলাল জুয়ালি হয়েছে ··· মাখনের মতো নরম মন ওয়াহেব হয়েছে

মাতাল—আর ব্যানার্জী এবং পাল হয়েছে গণিকাসক্ত! আমরা তাকে বলতুম—সীজার। তার কারণ কারো উপর তার নজর পড়লে অচিরে সিন্‌হা তাকে ভিনি ভিডি ভিসি করে দিত ... সুতরাং তার কবল থেকে আমার মুক্তি ... সে ছিল অসম্ভব ব্যাপার! যত বলি নেমন্তন্ন ... সে ধমক দিয়ে বলে তোমার সাত পুরুষের কোন্ কুটুম্বকে এখানে পেলে যে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে তোমার মুখে কালিচুন পড়বে! প্রকাশ করে বলতেও পারি না, কোথায় যেতে হবে ... কোথায় নিমন্ত্রণ! সে কথা জানতে পারলে ওকি আর ...

বসতে হলো সিন্‌হার সঙ্গে তাস খেলতে ... ব্রে খেলা! ... বাজি রাখার কথায় বললুম—ট্যাক গড়ের মাঠ সিঙ্গী ... বাড়ীতে কিছু বেশি টাকা পাঠাতে হয়েছে—ছোট ভাইয়ের একজামিন ... ব্রায়ানের কাছ থেকে ত্রিশটা টাকা ধার করেছি ... সামনের মাসে দেবার কড়ারে! ... সিন্‌হা বললে—তাতে কি ... ক্রেডিটে খেলা হতে পারে তো ...

খেলতে হলো ... খেলায় মন ছিল না ... মন ছুটে ছুটে চলেছে সেই বালিগঞ্জের পানে ... চাকারবার্টি সাহেবের সেই বিরাট প্রাসাদ; সেই প্রাসাদের সজ্জিত ঘরে বসে আছেন এনা দেবী, মীরা দেবী, আমার পথ চেয়ে অধীর প্রত্যাশায় ...

ঘড়ির কাঁটা ছুটে ছুটে এগিয়ে চলেছে ... পাঁচটা ... ছ'টা ... সাতটা ... গোধূলির ম্লান ছায়া নিবিড় হলো সন্ধ্যার ঘন কালিমায় ... সন্ধ্যার সে কালিমার উপরে ক্ষীণ চন্দ্রলেখার জলুশ ...

নটার আগে মিললো ছুটি ... হার-জিতের হিসাব-নিকাশ করে' সিন্‌হা বললে ... বেশি নয় ... বারোটা টাকা হেরেছো ... এখনি দিতে হবে না, পরে যখন সুবিধা হবে ... দিও মোদ্দা।

রাত্রে মনটা ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগলো ... অনুশোচনা এবং গ্লানির

কাঁটায়। অপমান ··· অপমান ··· অপমান করা হলো! আমার মতো অতিথি ··· তার জন্ত ওঁদের কিছু এসে যায় না ··· নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আমার ভাগ্য—সে ভাগ্যকে এমন ভাবে চূর্ণ করে দিলুম ··· শেলির কবিতা মনে পড়ল ···

Many a green isle there need be
In the deep wide sea of misery···

আমার দুনিয়া দুঃখে-অভাবে নিঃস্বতায় ভরে আছে ··· সে নিঃস্বতার মাঝখানে যদি এতখানি সম্পদ-সমৃদ্ধি ··· দুঃখের সাগরে সুখের দ্বীপপুঞ্জ ··· এমন করে' জলাঞ্জলি দিলুম। ···

··· কিন্তু এ অস্থিরতা, এ তো ব্যাধি ··· এ ব্যাধি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে! এ তো একটা জার্মান যুদ্ধ ··· সে যুদ্ধে করছি চাকরি ··· যুদ্ধ কি, না জেনে যুদ্ধের দৌলতে যেটুকু লাভ হয় ··· কিন্তু এ-যুদ্ধ কদিনের! এর পরে সারা জীবন আমাকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করে চলতে হবে। ওস্বপ্ন বিলাসে ··· এতটুকু প্রশ্রয় দেওয়া নয়, ও স্বপ্ন যত শীঘ্র মন থেকে বিদূরিত করে' দিতে পারি ···

এই ভেবে মনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতেই রাতটুকু গেল কেটে।

পরের দিন ও বাড়ীর চিন্তা যত পরিহার করে চলতে চাই ··· ততই ও চিন্তা বিরাট ভাবে মনকে ছেয়ে ধরে!··· ডিউটি শেষ করে বেরিয়ে পড়লুম ··· পথে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন পার হয়ে হজরৎগঞ্জের দিকে চলেছিলুম ··· সিগারেট গেছে ফুরিয়ে ··· সজ্জিত একটা দোকানে ঢুকে একটা টিন কিনলুম ··· ফাইভ ফিফ্টিফাইভ টিন ··· টিনটা কিনে পাশে রেখেছি, দেখি সামনে সেই প্রকাণ্ড মোটর—বুইক। এ গাড়ি চিনি, এ গাড়ীতে করে পরশু রাত্রে ব্যারাকে ফিরেছি ··· গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে আছে এক পোশাকের দোকানের সামনে! পারলুম না নিজেকে ওদিক

থেকে সরিয়ে রাখতে ... পায়ে পায়ে এলাম গাড়ীর কাছে ... গাড়ীর দিক থেকে দৃষ্টি চললো পোশাকের দোকানে ... মেয়েদের ভিড় ... খালি মেমসাহেব ... ওদের মধ্যে ঐ যে ... ঐ ... মীরা দেবী! এনা দেবী! না, তাঁর তো আসবার উপায় নেই ... অবশ অচল দু'খানি চরণ ... বেচারী ... বেচারী! এই বয়সে ... এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য!—

মমতায় গলে' মন যেন মন্দাকিনীর ধারা ...

হঠাৎ চোখের সামনে বিজলী চমক ... মীরা দেবী বেশ সপ্রতিভ চরণে এলো গাড়ীর সামনে ... সঙ্গে দোকানের এক বেয়ারা ... তার হাতে বাদামী কাগজের একটা মস্ত বাক্স ... ড্রাইভার খুললো গাড়ীর দরজা ... মীরা দেবী বসলেন আসনে ... বসে মুখ বাড়ালেন বাইরে ... চকিতের জন্য ... এবং সেই চকিত ক্ষণে আমাদের চোখে চোখে হলো মিলন ... তখনি তিনি চোখ নিলেন ফিরিয়ে—দোকানের বেয়ারা বাক্সটা দিলে ড্রাইভারের কাছে তুলে ... ড্রাইভার তার সিটে বসলো ... গাড়িতে স্টার্ট দেবে ... ফিরে তাকালো পিছনের সীটের দিকে ... এবং তার পর মুহূর্তে সে নামল তার গাড়ীর দরজা খুলে!... আমার একাগ্র দৃষ্টি গাড়ির উপরে ড্রাইভার এলো আমার কাছে। সেলাম করে জানালো গাড়ীতে মেম-সাব ...

এ-আহ্বানে দেহমন কেঁপে উঠলো ... সর্বশরীরে রোমাঞ্চ। সে-আহ্বানে তখনি দিলুম সাড়া ...

কানে এস্রাজের সুর ... লেফটেনাণ্ট-সাহেব!

স্বরে শ্লেষ! নমস্কার করলুম ... কণ্ঠে স্বর ফুটলো না।

মীরা দেবী বললেন—কাল এলেন না যে ...

কেঁপে উঠলুম—কোনোমতে জড়িত কণ্ঠে বললুম—হঠাৎ এমন ডিউটি পড়লো ...

মীরা দেবী বললেন—কাকাবাবু তাই বললেন ··· আমিও বুঝে নিলুম কিন্তু এনা বেচারী বেশ আঘাত পেয়েছিল। ওর ঐ মস্ত শারীরিক দুর্ব্বলতা ··· নিজেকে সব সময়ে বড্ড অসহায় মনে করে ··· ও একটুতে মুষড়ে পড়ে। কাল রাত্রে নিঝুম হয়েছিল, একেবারে কথা নয়, কিছু নয় ···

শুনে ইচ্ছা হলো, চীৎকার করে' ওঁকে বলি, স্নেহের আমি প্রচণ্ড অমর্য্যাদা করেছি, আমি নরাধম ··· আপনার মোটরের নীচে ফেলে দিয়ে আমার উপর দিয়ে মোটর চালিয়ে আপনি যান ···

কিন্তু মনে যে কথা জাগে, তার সব কি ভাবায় আমরা প্রকাশ করতে পারি! কাজেই চুপ করে' রইলুম।

মীরা দেবী বললেন—আপনার সঙ্গে দেখা হলো, ভালোই হলো, আজ এনা একবারটি শুধু আমাকে বলেছিল, একখানা চিঠি লিখে আপনার খবর নিতে। বলেছিল—নিশ্চয় তাঁর অসুখবিসুখ করেছে মীরা ···

আনন্দও হলো না, এমন নয়! কি জবাব দেবো এ কথায়? ভাষা ফুটলো না ··· ভাষা যেন হারিয়ে ফেলেছি!

মীরা দেবী বললেন—কাল ডিউটি আছে?

আশার ইঙ্গিত ··· সব হারিয়ে আবার যেন তা পাবার আশা! বললুম—না।

—তাহলে আশা করতে পারি—কালকের খেসারতীস্বরূপ?

বললুম—যদি ক্ষমা করতে পারেন, তাহলে ···

পরে মীরা দেবী বললেন—থাক থাক, মেয়েদের মতো সেন্টিমেণ্টাল হবেন না।

৫

মীরা দেবীকে কথা দিয়েছিলুম, পরের দিন যথাসময়ে ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটে ···

ফটকে ছিল সেই রৌশন শেয়ারা—অভ্যর্থনার জন্য! আমি যাওয়া মাত্র সসম্ভ্রমে সেলাম দিয়ে জানালো, বড় দিদিমণি আছেন টাওয়ারে, আমাকে সে টাওয়ারে নিয়ে যাবে।

লিফটে চড়ে' টাওয়ারে উঠলুম। প্রাসাদের মাথায় মিনার-ওয়ালা টাওয়ার—বিরাট, বিশাল আয়তন! ফুটবল খেলা চলে এতবড় ছাদ! ছাদের ও দিকে হাইব্যাক চেয়ারে বসে এনা দেবী। চেয়ারের গায়ে নানা রঙের আচ্ছাদন, চেয়ারের সামনে টেবিল; টেবিলের উপর একরাশ বই; একটা গ্রামোফোনও আছে—এই গুলিই প্রথম চোখে পড়লো।

চেয়ারের কাছে এগিয়ে এলুম। উনি এদিক পানে পিছন ফিরে বসে। পিছন দিক থেকে অভিবাদন জানাতে মনে জাগলো দ্বিধা! মনে হলো হয়তো বলি মনে-মনে কত স্বপ্ন রচনা করছেন ··· আমার কথায় ওঁর সে স্বপ্ন যদি ভেঙ্গে যায়! তাই ঘুরে নিঃশব্দে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালুম। দেখি, ওঁর দুই চোখ মুদ্রিত—পদ্মকলির মতো। রঙীন গ্লাসের র‍্যাগে দেহখানি ঢাকা—র‍্যাগখানা লুটিয়ে আছে পায়ের তলা পর্য্যন্ত। ঘাড়ের নীচে একটা বালিশ, দুপাশে আরো দুটি ছোট ছোট বালিশ। অস্তরবির রাঙা আভা পড়ে মুখখানি দেখাচ্ছে যেন সন্ধ্যার মলিন পদ্ম!

একাগ্র দৃষ্টিতে আমি সে রূপরাশি উপভোগ করতে লাগলুম—যেন একখানি ছবি! দুদিন এখানে এসে ওঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করেছি কিন্তু ভালো করে মুখের পানে চেয়ে দেখতে পারিনি। তাঁর মুখের পানে চাইবামাত্র আমার দৃষ্টি স্খলিত হয়ে সরে' পড়েছে ভয়ে, পাছে আমার দৃষ্টিশরে ওঁকে আঘাত করে! এমন নয়নমন ভরে রূপরাশি সম্ভোগ করছিলুম—রমণীয় মূর্তি! পাৎলা রাঙা দুটি ঠোঁট ··· নিশ্বাসের বাতাসে সমীর সঙ্গীত ··· শ্বাসপ্রশ্বাস ভরে বুকে দুলছে দুটি যেন কমলের কলি ··· জলের মৃদু তরঙ্গ যেমন দোলে, ঠিক তেমনি ভাবে ··· স্বচ্ছন্দে! চোখের নীচে ছায়ার রেখা ··· আবরণ মুক্ত গ্রীবা ··· গ্রীবায় নীল শিরা ··· স্বচ্ছ রক্তিম নাসাগ্র ··· সব মিলে মোহনীয় ছবি রচনা করেছে ··· মমতায় আমার মন ভরে' উঠলো ··· বেচারী ··· বেচারী! এমন রূপ এমন সরল কোমল মন ··· বিধাতা এঁকে কেন এমন জন্মের মতো খঞ্জ অসহায় করে' দিলেন! এঁকে সান্নিধ্য দিলে, এঁর সঙ্গে দুটো কথা কইলে, এঁকে দু-চারখানা গান শোনালে উনি যদি একটু আরাম পান, সেটুকু আরাম দিতে কেন আমরা ···

মমতায় স্নিগ্ধ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়ে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে রইলুম—ছাদে আর কেউ নেই—না মীরা দেবী, না চাকর-বাকর—কেউ নয়! মনে দ্বিধা জাগলো—এ আমার অন্যায়, অনুচিত, গর্হিত—একান্তে এক কিশোরীর রূপসুধাপান—তাঁর অজ্ঞাতে—আমার অভদ্র ইতর আচরণ উনি জানতে পারলে কতখানি লজ্জা পাবেন!

সরে গেলুম—সরে গিয়ে দূরে খানিক পায়চারি করলুম—তারপর আবার এসে দাঁড়ালুম ওঁর সামনে—তখনো নিদ্রামগ্ন ···

সময় চলেছে এগিয়ে দিনের সূর্য্য অস্তাচলে অনেকখানি হেলে পড়েছে ··· এনা দেবী একটা নিশ্বাস ফেললেন ··· টেবিলের উপর থেকে

একখানা বাঁধানো বই তুলে ইচ্ছা করে' সেখানা আমি ছাদে ফেললুম, মৃদু শব্দ ··· সে শব্দে এনা দেবী ঘুম ভেঙে চোখ মেলে চাইলেন ···

চমকে উঠলেন যেন ··· অপ্রতিভের মতো বইখানা তুলে টেবিলে রাখলুম। এনা দেবী বললেন—কতক্ষণ এসেছেন ?—কণ্ঠে অপরাধীর কুণ্ঠা !

বললুম—এখনি আসছি !

সলজ্জ মৃদু হাস্যে এনা দেবী বললেন—দেখুন তো, অসময়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ··· ভারী লজ্জা করছে আমার ··· আপনি মনে মনে কত হাসছেন হয়তো।

মৃদু হেসে আমি বললুম—জেগে লোকহাসানোর চেয়ে ঘুমিয়ে হাসানো ঢের ভালো ··· তাতে লজ্জা পেতে হয় না ··· নয় কি ?

দু'চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে বিঁধে প্রশ্ন করলেন—পরশু আসেননি কেন, বলুন তো ?

অকুণ্ঠ কণ্ঠে জবাব দিলুম—আপনি ঠিক বুঝবেন না, পরের গোলাম, তার উপর মিলিটারী গোলাম ··· ডিউটির আমাদের ঠিক-ঠিকানা থাকে না ··· কাজেই ভদ্রতা রক্ষা করা দায় হয় ···

বললেন—মীরার সঙ্গে কাল যদি দেখা না হতো, তাহলে আর আসতেন না বোধ হয় কখনো !

আমি বললুম—তা কেন বলছেন। এখানে যে সদয় স্নেহ প্রীতি পেয়েছি, আমার জীবনে সে যে কতবড় পাওয়া ··· আপনার বাবার উপর আমার কতখানি শ্রদ্ধা ···

একাগ্র দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ করে আমার কথা শুনলেন, তার পর বললেন—এখানে চা খাবেন ? না, নীচে গিয়ে ···

বললুম—আপনার যা অভিরুচি ···

টেবিলের একটা বোতাম টিপলেন, কোথায় কি ঘটলো জানি না, একটু পরেই বেয়ারা এলো। চাকা-লাগানো টেবিল-সমেত। টেবিলে চায়ের কেটলি, পেয়ালা-পিরীচ খাবারদাবারের পাত্র সমেত …

টেবিলটা এনা দেবীর হাতের নাগালে রেখে বেয়ারা গিয়ে দাঁড়াল দূরে, লিফটের দরজার পাশে …

উনি ঢাললেন পেয়ালায় চা। খাবারের পাত্র মুক্ত করলেন—ফল, পেস্ট্রি, বিসকিট, নিমকি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি …

চা খেতে খেতে উনি বললেন—জানেন, কাল কতখানি ভাবনা হয়েছিল আমার—চা খেতে এলেন না—তার পর ডিনার—আমাদের ঐ রৌশান বেয়ারা, ও ভারী বাধ্য আমার—এতটুকু বয়স থেকে কোলেপিঠে করেছে—চুপিচুপি ওকে বললুম—রাত তখন সাড়ে আটটা—বললুম, ঐ সাহেবের এখানে চা আর ডিনার খাবার কথা ছিল, এলেন না—হয়তো অসুখবিসুখ করেছে—খবর আনতে হবে। আপনার নাম লিখে দিলুম একটা স্লিপে—বকশিশ্ দিলুম পাঁচটাকা। ও সাইকেলে করে' গেল—ফিরলো নটার পরে—এসে কি বললে, জানেন?

বুকখানা কেমন ছ্যাঁৎ করে' উঠলো! কোনো জবাব না দিয়ে এনার পানে চেয়ে রইলুম। এনা দেবী বললেন—ক্লাবে তাস খেলছিলেন আপনি—আপনাদের আর্দালী সেখানে ওকে নিয়ে গিয়েছিল—ও আর আপনাকে ডিস্টার্ব করেনি—

এই পর্যন্ত বলে, এনা দেবী মৃদু হেসে আমার পানে চাইলেন। আমার মাথা হুয়ে পড়লো—হায় কেন, মীরা দেবীকে মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে গেলুম—উনি বললেন—ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল এ কথা শুনে।—বিশ্বাস হচ্ছিল না—তবু এ কথাও মনে হয়েছিল, আমারি অন্যায় —আপনার বন্ধু আছেন, বান্ধব আছেন, হাসি আছে, খেলা

আছে—আমাদের এখানে কষ্ট করে কেনই বা আসবেন—এ আমার অন্যায় আস্পর্ধা—মানে, যাঁরা আসেন এখানে, আমার সঙ্গে তাঁদের শুধু আহা-উহু সম্পর্ক—আমি চলতে পারি না, কোথাও যেতে পারি না, তার জন্য শুধু হা-হুতাশ!—আপনি কিন্তু বেশ বন্ধুর মতো মিশেছিলেন। তা ছাড়া, মস্ত লোভ মনে জেগেছে, বাঙলা গান শিখবো আপনার কাছে।—এত বড় বাড়ি—সব কেমন পুরোনো একঘেয়ে ঠেকে আমার ... বাঙলা গান শিখতে পেলে একটা তবু অবলম্বন পাবো!—তা যাক—মন তো খুবই খারাপ হয়েছিল—মিথ্যা বলবো না, রৌশানের কথা শুনে মনে বেশ আঘাত পেয়েছিলুম! ভাগ্যে কাল মীরার সঙ্গে পথে আপনার দেখা হয়েছিল—মীরা বললে, হঠাৎ ডিউটি পড়ার দরুন আপনি আসতে পারেন নি।

কথাগুলো শুনলুম যেন কঠিন ভৎর্সনার মতো। এবারো কোনো জবাব দিতে পারলুম না। এনা দেবী বললেন—আমি সব সহ্য করতে পারি—পারি না শুধু সহ্য করতে আমার অসুখের জন্য কেউ হা-হুতাশ করবে, আর মিথ্যা স্তোকে বা মিথ্যা আশা দিয়ে আমাকে বোকা বেচারী বানাবে। জানেন, ক'দিন আগে আমার এক নতুন দাসী এসেছিল—গেঁয়ো মানুষ—আমার ঘর ঝাঁট দিতে এসে হাতের ঝাঁটা ফেলে হাউ হাউ করে' কেঁদে উঠলো—বলে, মা গো, এমন বড় ঘরের মেয়ে—এমন রূপসী তার এমন দশা!—তার কান্না শুনে বাড়ি শুদ্ধ লোক হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলো—তাকে ধরে টানাটানি। আমি বললুম—সত্য কথাই ও বলেছে—তোমাদের মতো নিঃশব্দে করুণ চোখে আমার পানে চেয়ে থাকে নি। আমি কতখানি অসহায় আমি তা যেমন জানি, আর কেউ তা জানে না—তাই কারো দয়া আমি কেমন সহ্য করতে পারি না।—আপনাকে হঠাৎ এত কথা কেন বলছি,

জানি না। তবে বাবা কাল আপনার কথা বলছিলেন। বলছিলেন, আপনি খুব আশ্চর্য মানুষ।

আমার বিস্ময়ের সীমা নেই! বাবা অর্থাৎ মিস্টার চাকারবার্টি আমাকে কতটুকু জানেন—সেই জানাটুকুর উপর নির্ভর করে …

চিন্তার সূত্র গেল কেটে একটা শব্দে। চোখ তুলে দেখি, লিফটে চড়ে ছাদে এসেছেন মিস্টার চাকারবার্টি—জড়ো সড়ো ভীরু মূর্তি। তিনি এলেন এনা দেবীর কাছে। …

অভিবাদনাদির পর তিনি বললেন—ভারী খুশি হলুম তোমায় দেখে—কি জানি, তোমাকে আমার এত ভালো লাগে—নিজে থেকে আজ আসতে চেয়েছিলে এবং এই যে এসেছো এতে আমাদের আনন্দের সীমা নেই। এনা খুব খুশি। জানো বাবা, হেঁ হেঁ, কিছু মনে করো না—বুড়ো মানুষ মনের আবেগে—বাবা বলেছি, লেফটেনাণ্ট গাঙ্গুলি বলিনি।

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম—লেফটেনাণ্ট না বললেই এখানে আমার আসা-যাওয়া সহজ হবে।

—আমি তা বুঝি বাবা—মিস্টার চাকারবার্টি বললেন, জানো বাবা, জীবনে আজ প্রথম এনা উপরের এই টাওয়ারে এসে বসেছে।

কোনোমতে কণ্ঠের জড়তা কাটিয়ে আমি বললুম—সত্যি? ছাদ থেকে কিন্তু চারিদিক কি চমৎকার দেখায়!

উনি বললেন—এখন শীতকাল, গ্রীষ্মকালে দুর্বীন চোখে এই টাওয়ার থেকে কানপুরে গঙ্গার উপরে যে রেলওয়ে ব্রিজ আছে, তার আভাস পাওয়া যায়!

এরপরে কি কথা বলবো ভেবে পাচ্ছিলুম না। মিস্টার চাকারবার্টি

বললেন—এখনি ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়বে মা, আমরা নীচে নেমে যাই চলো, কেমন ?

—হুঁ—এনা জবাব দিলেন।

তারপর বেয়ারারা এলো, বইগুলো জড়ো করা, প্লেট-পেয়ালাগুলো গুছিয়ে নেওয়া, এনাকে গরম কাপড়ে ঢাকাঢুকি দেওয়া, হাতাহাতি এগুলো সরান হলো ছু-চার মিনিটে এবং রোশান তাঁর ইনভ্যালিড চেয়ার গড়িয়ে লিফ্‌টে দিলে তুলে ···

এনাকে নিয়ে লিফ্‌ট নামলো। মিস্টার চাকারবার্টি এবং আমি ছুজনে উপর তলায় ল্যাণ্ডিংয়ে। চাকারবার্টি বললেন, তুমি যদি কিছু মনে না করো বাবা, তাহলে তোমাকে আমি বলতে চাই ···

কৃতার্থ বোধ করলুম। বললুম—নিশ্চয় বলবেন—যা বলতে চান।

—এনার অসাক্ষাতে বলতে চাই।···এনার এখন মেশাজ চলবে ··· আমরা ছুজনে আমার বসবার ঘরে গিয়ে বসবো'খন। কেমন ?

আমি বললুম—কেন আপনি এমন কুণ্ঠিত হচ্ছেন! আমাকে আপনার ছেলের মতন যদি মনে করেন ···

আবেগভরে আমার হাতছুখানা চেপে ধরে চাকারবার্টি বললেন—এনফ্‌, মাই বয়, তুমি আমাকে কৃতার্থ করলে ···

লিফ্‌ট এলো, আমরা ছুজনে নামলুম। নেমে চাকারবার্টি আমাকে নিয়ে বসালেন তাঁর পার্লারে।

কামরাখানি খুবই সাধারণ, আসবাবপত্র পুরোনো এবং তেমন দামী নয়। দেওয়ালের গা পেইন্ট করা, সে পেইন্টও মাঝে মাঝে খসে ঝরে গেছে, স্যাঁতানে গন্ধে ঘর ভরে আছে। মনে হলো, যত ঐশ্বর্য বিলাস, সব তিনি উজাড় করেছেন মেয়ের তৃপ্তি-সাধনায়, নিজের

চাল বৈরাগীর মতো! মুগ্ধ হলুম। ধনীর এমন মনের পরিচয় কোথাও কখনো পাইনি! ধনী দেখেছি তো কিছু, সকলকেই দেখেছি, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরামের দিকে প্রবল প্রখর দৃষ্টি!

ঘরে একখানি মাত্র গদিজোড়া কোচ, জোর করে সেটাতে আমাকে বসালেন, বসিয়ে নিজে বসলেন একটা বেতের চেয়ার টেনে। কিছুক্ষণ দারুণ স্তব্ধতা—সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনিই আগে কথা বললেন, বললেন—কোটীপতি ভদ্রলোক আমার কাছে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গীতে—যেন কি অনুগ্রহ প্রার্থনা করবেন, এমনি ভাব! উৎকণ্ঠায় আমি একেবারে আকুল।

অনেকক্ষণ গেল কেটে। তারপর চাকারবার্টি মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললেন। চমকে তাঁর পানে চাইলুম, কপালে ঘাম, চোখের চশমা খুলে রুমালে চশমা মুছে, কপালের ঘাম মুছে কেসে তিনি গলা সাফ করলেন। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন অভিনয় দেখছি। তারপর হঠাৎ উনি বললেন—তোমার অনুগ্রহ চাই বাবা। আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে যদি দয়া হয়, তাহলে—মানে, যা বলবো, হয়তো তাতে আমার স্পর্ধাই প্রকাশ পাবে, কিন্তু আমি কতখানি নিরুপায়, কতখানি অসহায় বুঝে তবে আমার বিচার করো। আমি যা বলবো অকপট সত্য, তার কোথাও এতটুকু অত্যুক্তি পাবে না। জানো না কি পাথর বুকে নিয়ে আমার দিন কাটছে! এক এক সময় এমন মনে হয়েছে, আত্মহত্যা করি, কিন্তু আত্মহত্যা করবারও উপায় নেই, এমনি শৃঙ্খলে আমি বাঁধা। শুনবে আমার কথা?

আবেগে আমার কণ্ঠ জড়িত, মাথা নেড়ে বললুম—শুনবো।

—বেঁচে থাকো, চিরজীবী হও!··· তোমাকে কতটুকু বা দেখেছি, তবু মন তোমাকে অত্যন্ত আপনজন বলে গ্রহণ করতে আকুল! বয়স

হলে, মানুষ বোধ হয় একটু দেখেই অপরকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে। আমার স্ত্রী বলতেন—তাঁর কাছেই আমার শিক্ষা—তিনি বলতেন, মানুষকে দেখলেই বোঝা যায় ভালো, না, মন্দ। তিনি পারতেন ঠিক বুঝতে—আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন!

প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস, তার পর বললেন—এনার এ দুর্ভোগ দেখার দায় থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন! তিনি এ সহ্য করতে পারতেন না। গেছেন, ভালোই হয়েছে তাঁর পক্ষে! এনার এমন হবে, স্বপ্নেও কেউ ভাবেনি। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি রাখিনি! পাঁচজনের মতো হেসেখেলে বেড়াবে, দেখলে মনে হবে, পাখী, না, প্রজাপতি—তার এ কি দুর্ভাগ্য বলো তো! নিমিষের ঘটনা, হঠাৎ, তার ফলে ওর ইহজন্মটা মিথ্যা হতে বসেছে। বইয়ে পড়ি, খবরের কাগজে পড়ি, দুনিয়ায় কত মিরাকল ঘটছে, কত পঙ্গু সচল হচ্ছে, কত অন্ধ চোখের দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে, কিন্তু আমার এনা ...

আবার নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলে চাকারবার্টি বললেন—দিব্যি সুস্থ মেয়ে, চমৎকার বুদ্ধি, জন্মাবধি কখনো একটা কঠিন রোগে ভোগেনি, তার এমন হবে, কে ভেবেছিল! এ-চিকিৎসায় সারলো না, ও চিকিৎসায় সারবে, ওতে সারলো না, তাতে সারবে—এমনি ভাবে চিকিৎসা চলেছে সমানে, বিরাম দিইনি কখনো; এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাকিমী, কবিরাজী, জার্মানিতে নিয়ে গেছি, সুইজার্লাণ্ডে নিয়ে গেছি, রাশিয়ায় নিয়ে গেছি—সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছি! জীবনে আমি বহু অন্যায় করেছি—পাপ—আমার সে পাপেই আমার নিরীহ মেয়ে, এই বয়সে সারা জীবন বিছানায় পড়ে থাকবে! ভগবানের একি বিধান! ডাক্তারেরা স্রেফ ধাপ্পা চালিয়ে এসেছে। যে যত পয়সা চেয়েছে দিয়েছি, লুঠবাজের মতো পয়সা

লুঠ করেছে, মেয়েটার পানে তাকায়নি! এমন নিষ্ঠুর মমতাহীন! এরা ডাক্তার! আগে সর্বশরীর অবশ ছিল—বিছানায় পড়ে থাকতো শুধু নিশ্বাস পড়তো ··· আর লিকুইড খাওয়ানো হতো। রাশিয়ায় যা চিকিৎসা হলো, তাতে দেহের উপর দিকটা হলো সবল সক্রিয়, কিন্তু কোমরের নীচে থেকে পা দুখানা রয়ে গেল অবশ। দেহে আঁটা আছে মাত্র, কোনো কাজের নয়। রাশিয়া থেকে ফেরবার পর একজন নূতন ডাক্তার দেখছেন। ইনি বাঙালী, এঁর নাম মণি মজুমদার। ইনি বিলিতী পাশ। এঁর মধ্যে ধাপ্পাবাজি দেখিনি। পয়সার লালসাও দেখিনি, চালচলনে সেকেলে বাঙালীর মতো। ইনি থাকেন কানপুরে। নাম শুনেছো কিনা জানি না।

বললুম—আজ্ঞে না, আমি এঁর নাম শুনিনি।

চাকারবার্টি বললেন—কি করে শুনবে? ঢাক ঢোলের কোনো তোয়াক্কা ইনি রাখেন না। তারপর তুমি ছেলেমানুষ, নীরোগ সুস্থ দেহ, তিনিও নাম বাজিয়ে বেড়াবেন না তো। মানে, তাঁকে না দেখলে তুমি ঠিক বুঝবে না। তাঁকে প্রথম পেয়েছিলুম, আমার স্ত্রীর অসুখের সময়। যমের সঙ্গে যাকে বলে যুদ্ধ—তিনি সেই যুদ্ধ করেছিলেন, অন্য সব ডাক্তার 'আশা নেই' বলে চলে গেলেও ইনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাশে ছিলেন, আমায় ত্যাগ করে' যাননি। তাঁকে দেখে বুঝেছি—হাঁ, এঁকেই বলে ডাক্তার! যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ রোগীর সম্বন্ধে আশা ছেড়ে পালান না অন্য সব ডক্তারের মতো। নিজের কথা, টাকা পয়সার কথা তাঁকে ভাবতে দেখিনি, দেখেছি তাঁর ধ্যান বলো জ্ঞান বলো তাঁর রুগী। আর্ত-আতুর যারা রোগে ভুগছে, তারাই তাঁর সব। আশ্চর্য মানুষ, অসাধারণ মানুষ এই ডক্টর মজুমদার!

বলতে বলতে বৃদ্ধ চাকারবার্টির মনে জাগলো যেমন উৎসাহ,

তেমনি উত্তেজনা। দুটি চোখ ছিল অবসাদের ভারে মলিন, সে দুই চোখে ফুটলো দীপ্তি!

তিনি বললেন,—আমি এতটুকু বানিয়ে বলছি না বাবা। সত্যই আশ্চর্য মানুষ এই ডক্টর মজুমদার! রোগীকে আরাম দিতে না পারলে গ্লানিতে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়—'হোপলেশ' বোলে কোনো রোগীকে তিনি কখনো ত্যাগ করেন না। শোনো, তোমাকে বলি তাঁর জীবনের এক আশ্চর্য কাহিনী! এক মহিলার হয়েছিল চোখের ব্যামো। বহু ডাক্তার দেখিয়েছিলেন তিনি। কলকাতা, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বোম্বাই, পুণা, দিল্লী—যেখানে যত ভালো চোখের ডাক্তার, সকলকে দেখালেন। তাদের রকমারি চিকিৎসায় মহিলার চোখ তো সারলো না, অন্ধ হবার জো! চিকিৎসা করাতে করাতে সর্বস্বান্ত হলেন। তখন ডক্টর মজুমদারকে তিনি ধরলেন। মজুমদার চিকিৎসা শুরু করলেন লাস্ট স্টেজে, চোখ সারলো না, মহিলা অন্ধ হলেন। তখন মজুমদারের গ্লানির সীমা নেই। তিনি ভাবলেন, তাঁর চিকিৎসার দোষেই চোখ গেছে। সারাজীবন অন্ধ-মেয়েকে কে দেখবে? কুমারী মহিলা, চোখের ব্যামোর স্বত্রপাত হয়, তাঁর বয়স তখন ষোল বছর। মজুমদারের হাতে যখন অন্ধ হলেন, বয়স ত্রিশ, অপরাধের গ্লানি তার। মজুমদার কি করলেন জানো? প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মহিলাটিকে তিনি বিবাহ করলেন। মহিলা আজো বেঁচে আছেন অন্ধ হয়ে, আর সেই অন্ধ স্ত্রী—স্ত্রীকে সর্বময়ী করে' রেখেছেন! ডক্টর মজুমদার দেখচেন এখন এনাকে। আমার বিশ্বাস, কেউ যদি এনাকে সুস্থ করতে পারে তো পারবেন শুধু ডক্টর মজুমদার!

এই পর্যন্ত বলে' শুধু ঘড়ির দিকে তাকালেন, তার পর বললেন—হ্যাঁ, এখন শোনো বাবা, তোমার কাছে আমার যা প্রার্থনা। ডক্টর মজুমদার

বলেন, এনার সম্বন্ধে অধীর হলে চলবে না। তিনি ওর উন্নতিই লক্ষ্য করছেন, তবে আমি বেঁচে থেকে ওকে সুস্থ দেখতে পারবো কি! মনে সন্দেহ জাগে! সেই সন্দেহের জন্ম এক এক সময় ওর ভবিষ্যৎ ভেবে আমি যেন পাগল হয়ে যাই।

বলতে বলতে চাকারবার্টি উঠে দাঁড়ালেন, সবেগে পায়চারি করতে লাগলেন, তারপর মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে আমার কাছে এসে বসলেন, বললেন—কিছু মনে করো না বাবা, এত কথা তোমাকে আমি বলতে চাইনি। হঠাৎ কেমন—কি কথা বলছিলুম তোমাকে? ও, হ্যাঁ ঠিক, ডক্টর মজুমদার থাকেন কানপুরে, একটা নার্শিং হোম করেছেন। দুরারোগ্য বহু রোগী আছে সে হোমে। উনি দেখেন সকলকে আত্মীয়ের স্নেহ নিয়ে। দু-হপ্তা অন্তর এখানে একবার করে' আসেন এনাকে দেখতে। উপায় থাকলে ওঁকে এখানে আমি আটকে রাখতুম, কিন্তু তা হবার নয়, ওঁর নার্শিংহোমে বহু রোগী। কাল বিকেলে উনি এখানে আসবেন। বিকেলেই আসেন, তারপর এনাকে দেখেশুনে রাত্রে এখানে খাওয়া দাওয়া সেরে এগারোটার এক্সপ্রেশে কানপুরে ফেরেন। তোমাকে পেয়ে অবধি আমার কেবলি মনে হচ্ছে, আমাকে উনি এনার সম্বন্ধে আশা যা দিচ্ছেন, তা হয়তো আমি বাবা, আমাকে ভুলোবার জন্য—তাই, মানে, তুমি আমাদের আত্মীয় নও—তোমাকে ছাখেননি, জানেন না, তাই মানে, কৌতূহলী হয়ে তুমি যদি জিজ্ঞাসা করো,—মানে, তুমি যদি ওঁকে বলো, কেমন দেখচেন? সারবে? না, সারাজীবন এমনি পরের উপরে নির্ভর করেই ওর দিন কাটবে? মানে, সত্যই মেয়েটা সারবে? না, ওঁর এক্সপেরিমেণ্ট চলেছে মেয়েটার উপর। সারা সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমি এ প্রশ্ন করছি, এটুকু না উনি বোঝেন। পারবে বাবা, এটুকু দয়া করতে?··· ওর আসল

ভত্তয়ের উপর আমার কতখানি নির্ভর···কথা শেষ হলো না, আবেগে কণ্ঠ হলো রুদ্ধ।

কি করে' ওঁকে বলি 'না', এ প্রশ্ন আমি করতে পারবো না? উচিত হবে না। বাপের প্রাণ! আহা! দিলুম ওঁকে প্রতিশ্রুতি। বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করবো।

আনন্দে বৃদ্ধ একেবারে অভিভূত হলেন। বললেন—আমি জানতুম বাবা, আমাদের উপর তোমার সত্যই স্নেহ হয়েছে! এনার উপর মমতা। আমার মন আমাকে একথা বলে' দিয়েছে। ভদ্র ঘরের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছো, তুমিই যোগ্য ব্যক্তি! আমি কথা দিচ্ছি, এ কথা আর কেউ জানবে না, শুধু তুমি আর আমি ছাড়া! ওঃ, আমার কী উপকার যে করবে তুমি! আমাকে কি স্বস্তি না দেবে!

আমি বললুম—কিন্তু এ তো খুব সামান্য ব্যাপার—এটুকু করবো, তার জন্য আপনি ···

বাধা দিয়ে উনি বললেন—সামান্য নয়, এটুকুও নয় বাবা, আমার কাছে এ অসামান্য। এ উপকারের জন্য তোমার কাছে আজীবন আমি ঋণী থাকবো বাবা। তোমার এ ঋণ শোধ দেবার সামর্থ্য আমার কোনো দিনই হবে না। যদি বলো ···

ছোট্ট ইঙ্গিত। এ ইঙ্গিতে আমি বেশ কঠিন দৃষ্টিতে চাইলুম ওঁর পানে।

উনি অপ্রতিভ হলেন, বললেন—না, না, বাবা, তুমি ভুল বুঝো না। পয়সা-কড়ি দিয়ে এ ঋণ শোধ হয় না, হবার নয়। পয়সা-কড়ির কথা তুলে তোমার অমর্যাদা করবো এতখানি অমানুষ আমি নই। আমি জানি, জানি তুমি এসবের অনেক ঊর্ধ্বে—তা নয়। আমি ভাবছিলুম, ওয়ার-কমিটির চাঁইদের সঙ্গে আমার খুব অন্তরঙ্গতা আছে!

যদি বলো, তোমার কথা আমি বলতে পারি। তুমি কি-মানুষ শুধু সেই পরিচয়টুকু দিয়ে তাদের জানাবো, নিজের ক্ষমতায় বড় হবার সুযোগটুকু শুধু তাঁরা দেবেন—তাঁদের অনুগ্রহ নয়, আমার সুপারিশ নয়—তোমার শক্তির পরিচয়টুকু শুধু ···

এ কথার জবাব দিলুম না। উনিও চুপ করে রইলেন। এরপরে অনেকক্ষণ দুজনে দুজনের পানে চাইতে পারিনি। তারপর হঠাৎ চশমা জোড়া খুলে সাফ করতে করতে উনি বললেন—এসো, আমরাও ঘরে যাই। এনার মেশাজ হয়ে গেছে এতক্ষণে। সে আমাদের প্রত্যাশায় হয়তো ··· বেশিক্ষণ সরে থাকলে ও কেমন উতলা হয় ··· ভাবচে ওর কথাই বুঝি কইছি আমরা! ভুগে ভুগে ভয়ানক অভিমানী হয়েছে ও ··· অপরাধ কি! এঘর আর ওঘর ··· জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নেই ··· বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা নেই, আশাও নেই! এর উপরে যাঁরা এ বাড়ীতে আসেন তাঁদের চোখে করুণ ব্যাকুল দৃষ্টি, কথা কন্ ওর উপর দরদ্ আর মমতা জানিয়ে। এসো বাবা, তোমার গান শেখানো নিয়ে অনেকখানি বৈচিত্র্য পাবে, আশা পাবে এনা ···

৬

সে-রাত্রে গানে-গল্পে এনাকে সুখী করে' ব্যারাকে ফিরলুম। চাকারবার্টির মোটরে চড়ে!... ঘুম কিন্তু হয় না। চিন্তা আর চিন্তা! চাকারবার্টিকে মুখে তো আশ্বাস দিয়ে এলুম—সামান্য ও উপকারটুকু করবো বলে ... এবং সেজন্য পরের দিন পেলুম সাদর নিমন্ত্রণ। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কেবলি মনে হতে লাগলো, এ-প্রশ্ন করা খুবই কঠিন হবে! তিনি বিচক্ষণ ডাক্তার, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ নেই, পরিচয় নেই, তার উপর এখানে আমার বাড়ি নয়, এ-শহরে এসেছি মিলিটারি চাকরির দৌলতে, ক্ষণিক অতিথি, প্রথম সাক্ষাতেই তাঁকে তাঁর রোগীর সম্বন্ধে এমন প্রশ্ন করবো! বিশেষ রোগী হলেন কুমারী কিশোরী, আমি এঁদের অনাত্মীয়, আমার থাকাটাও—

কিন্তু যৌবনে মন অসমসাহসের কাজে হঠতে চায় না! তার উপর এ বয়সে নিজের বুদ্ধি আর শক্তি সামর্থ্যের সম্বন্ধে এমন নিশ্চিত নিঃসংশয় ধারণা থাকে ... এতবড় বিশ্বাস যে মনকে এ দিক থেকে নিবৃত্ত করাকে মনে হয় ভীরুতা। ডিউটি এক এক সময়ে ভয়ানক কঠিন হয়, তবু তা থেকে সরে থাকা যায় না তো...মনকে বোঝালুম। এ'ও আমার মিলিটারি ডিউটি ... এই সঙ্গে আরো মনে হলো, কি আশ্চর্য আমার প্রকৃতি ... এ বাড়িতে ক'দিন বা এসেছি ... অথচ সকলেই আমায় এমন পরমাত্মীয়ের মতো বিশ্বাস করলেন কেন? এতখানি বিশ্বাস আমার উপরেই বা হলো কেন? এনা রোগে অমন

কাতর ··· তবু আমাকে কাছে পেলে আরাম বোধ করে! তার এ ব্যাধিকে সে যেন দুর্লঙ্ঘ্য বিধান বলে' মেনে নিয়েছে।···

আমার মন অধীর হলো। কাল কখন, কখন ডাক্তার মজুমদারের সঙ্গে দেখা হবে! কতক্ষণে ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। কি উত্তর পাবো সে প্রশ্নের—এই সব ভেবে!

পরের দিন বেলা তিনটে বাজবামাত্র বেরিয়ে পড়লুম। সব প্রথম দেখা হলো মীরার সঙ্গে। মীরা বললেন—কানপুরের ডাক্তার এসেছেন—ডাক্তার মজুমদার—এনাকে দেখছেন। উনি এসেছেন প্রায় একঘণ্টা আগে। ওঁর দেখার পরে এনা ভয়ানক ক্লান্ত হয়, আমাদের সঙ্গে না কয় কথা, না করে হাসি গল্প!

মীরার সঙ্গে নানা কথা কয়ে বুঝলুম। আমার সঙ্গে চাকারবার্টির যে পরামর্শ হয়েছে, তা সে জানে না। মীরার সঙ্গে নানা কথা হলো, এ বাড়ির কথা—আমার ঘর-সংসারের কথা—এবং আমাদের কথার মাঝখানে এলেন চাকারবার্টি, তাঁর পিছনে ডাক্তার মজুমদার! দুজনে ঘরে ঢুকলেন কথা কইতে কইতে। ডাক্তার মজুমদারকে দেখবামাত্র তাঁর কথা শুনে তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে যে-ধারণা জন্মেছিল, তা গেল বদলে! অদেখা কোনো মানুষের অসাধারণত্বের কথা শুনলে মন তাঁর যে-মূর্তি গড়ে তোলে কল্পনাবশে, আমি তেমনি ডাক্তার মজুমদারের একটা মূর্তি মনে মনে গড়ে নিয়েছিলুম। আমি এঁকেছিলুম প্রদীপ্ত মুখচোখ দিব্য কান্তি সুপুরুষের মূর্তি, কিন্তু প্রত্যক্ষ যা দেখলুম, বেঁটে চেহারা, মোটা দেহ, মাথায় টাক, চোখে কম দেখেন, পোশাক-পরিচ্ছদও অত্যন্ত সাধারণ গোছের।

ওঁরা দুজনে বসলেন—আমার একটু দূরে—পথ্যাদির কথা হলো,

উৎকর্ণ হয়ে শুনলুম। তারপর চাকারবার্টি দিলেন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে। সহাস-মুখে আমার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে ডক্টর মজুমদার বললেন—আলাপ হলো বটে কিন্তু কিছু মনে করো না মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড, আমার ভারী খিদে পেয়েছে। পেটে আগুন জ্বলছে। কিছু না খেলে আলাপ জমাতে পারবো না। ইয়েস্‌, মিস্টার চাকারবার্টি, আপনার বাবুর্চিকে বলে দিন, আমার জন্য খান দুই স্যাণ্ডুইচ আর খান দুই পেস্ট্রি যেন নিয়ে আসে, তার সঙ্গে এক পেয়ালা কফি অবশ্য! আসবার সময় ঐ এক্সপ্রেসটায় রেস্তোঁরা-কার থাকে না। এ কথা আসবার সময় মনে হয় না, হলে বাড়ি থেকে কিছু খাবার বয়ে নিয়ে আসতে পারি। হা হা হা ···

চকিতে এলো খাবার। মজুমদার বললেন—আপনার বাবুর্চিটি জুয়েল। যেখানে যাই, একথা বলি। ও ঠিক বোঝে, আমি এসে কি খেতে চাইবো—পেস্ট্রিটাও ও যা তৈরি করে, খাশা! এর কাছে কোথায় লাগে বিলিতী কন্‌ফেকশানারীর তৈরি পেস্ট্রি! ··· আ—

কারো পানে দৃষ্টি নেই, আহারে মনোনিবেশ। বাবুর্চিটি এনে দিল অনেক কিছু—স্যাণ্ডুইচ, পেস্ট্রির উপরে ছিল সুপ—ডাক্‌ রোস্ট—ডাক্তার সুপের প্লেটটা ধরে তাতে মারলেন চুমুক—অত্যন্ত পিপাসা হলে মানুষ যেমন করে' জল খায়, তেমনি একেবারে অগস্ত্য-পান! তারপর এটা—ওটা ··· টিফিন যা খেলেন, আমাদের পুরোদস্তুর ডিনারের সামিল! মনে হলো, ডাক্তার যেন কোন্‌ অন্নহীন দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসছেন। খাওয়া শেষ হলে তাঁর মুখে ভাষা ফুটলো! তিনি বললেন—হ্যাঁ, খাশা! আপনার বাবুর্চিটি ফার্স্ট ক্লাশ—ওর হাতের রান্না—আমার কী ভালো লাগে! শুধু ওর হাতের রান্নার লোভে আমার মনটা এখানে আসবার জন্য আকুলি বিকুলি করে!

সিগার এলো। ডাক্তার একটা সিগার তুললেন বাক্স থেকে, তুলে সেটা নেড়ে চেড়ে বললেন—না, এ সিগার নয়। এ আমার চলবে না! সেবারে এসে বলে গেলুম, রিয়াল হাভানা, আপনার লোককে বলুন, এখনি গিয়ে আনবে, হজরতগঞ্জে পাওয়া যায়—মুরাদ কোম্পানির দোকানে ···

শশব্যস্তে চাকারবার্টি বেয়ারা পাঠালেন তখনি। তারপর এনার সম্বন্ধে কথা! বললেন—আর বারে যা দেখে গেছি, এবারে তার চেয়ে অনেক ভালো দেখলুম। শী লুক্‌স্ ব্রাইট্—এ খুব ভালো লক্ষণ। আমার এ ওষুধটা এ্যাকটু করছে ভালো। মোদ্দা, ভাবছি, একবার যদি এনাকে গাড়িতে তুলে খুব খানিকটা ঘুরিয়ে আনতে পারেন। ওর মনের উপরে একটা পর্দা পড়ে আছে, সেই পর্দাখানা যদি বাইরের আলো-বাতাসে খানিক সরানো যায় ···

চাকারবার্টি বললেন—ও বেরুতে চায় না। না হলে ধরাধরি করে' গাড়িতে বসানো তো শক্ত নয়। ও বলে, না, লোকে হাঁ করে' তাকিয়ে থাকবে—বললে চাকারবার্টির সেই বেচারী মেয়েটি ···

—হুঁ—ডাক্তার বললেন—সাম্ প্যাস্টাইম—যা ওর ভালো লাগে ···

চাকারবার্টি বললেন—এই ছেলেটিকে পেয়েছি, ইনি ভালো গান গাইতে পারেন—বাঙলা গান। এনার খুব ভালো লেগেছে এঁর গান। এঁকে বলেছি, এনাকে দু-চারখানা বাঙলা গান শেখাতে, ইনিও ভারী ভালো, শেখাতে রাজী হয়েছেন ···

আমার পানে চাইলেন ডক্টর মজুমদার, বললেন—ভালো ভালো; খুব ভালো কথা! ওর মনটাকে কোনো-কিছুতে এনগেজ রাখা—জাস্ট এ ডাইভার্শন, সেই সঙ্গে আমার এই নতুন ওষুধ, আমার বিশ্বাস, আমি ফল পাবো মিস্টার চাকারবার্টি!

চাকারবার্টির মুখে কথা নেই, অপলক নেত্রে তিনি চেয়ে আছেন ডাক্তারের পানে—কেমন অভিভূত দৃষ্টি!

ডাক্তার মজুমদার বললেন—এমনি চলবে—যা চলছে! তবে আমি চাই শরীরকে মাঝে মাঝে একটু ছড়িয়ে দেয়া। সেটুকু হবে একসারসাইজ! তবে এবারে ওর মনে বেশ পরিবর্তন দেখলুম। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করতে পারেননি, আমি কিন্তু ওকে দেখবা-মাত্র সেটুকু লক্ষ্য করেছি। কবি হলে বলতুম।··· অন্ধকার ঠেলে ওর মনে আলোর আভাস জেগেছে।··· তামাসা নয়, সত্যই তাই!

চাকারবার্টি সাড়া দিলেন—যেন চেতনা পেয়ে। বললেন—এ তো ভালো লক্ষণ—

—নিশ্চয়! বুঝছেন না, রোগীর মন যখনই দেখবেন, খানিকটা প্রফুল্ল, তখনি বুঝবেন, আরোগ্যের সম্ভাবনা জাগছে!—আমি এটুকু প্রত্যাশা করিনি। এতকাল ধরে ওকে দেখছি, আজ প্রথম মনে হলো, যেন ওর নাগাল পেয়েছি!··· যাইহোক, লক্ষণ ভালো এবং আমার মনে হয় স্পষ্ট কথা বলতে আজ আর বাধবে না···আপনি কি অন্য কোনো ডাক্তারকে এর মধ্যে আনিয়েছিলেন ওকে দেখবার জন্য? মানে, আর কেউ এনার চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করেছে এর মধ্যে?

এতবড় অপবাদ! চাকারবার্টি শিউরে উঠলেন, বললেন—এ আপনি কী বলছেন! এ কখনো সম্ভব—এত বড় কঠিন রোগ! আপনার হাতে রোগীকে রেখে নিশ্চিন্ত আছি। এর মধ্যে ডাকবো অন্য ডাক্তার? না-না-না—

ডাক্তার মজুমদার বললেন—যাই হোক, মোদ্দা দিস্ ইজ মিরাক্‌ল্—

চাকারবার্টি বললেন—কিন্তু কি ভালো লক্ষণ আপনি দেখলেন, অথচ আমরা কিছু লক্ষ্য করছি না—এটুকু যদি দয়া করে বুঝিয়ে দেন—

নিজের পকেট থেকে একটা আধপোড়া সিগার বার করে' সেটা জ্বালিয়ে ডাক্তার বললেন—কঠিন প্রশ্ন করলেন, বন্ধু। ভাবনার কোনো কারণ নেই, আমি সরল সত্য বলেছি। যদি মন্দ মনে করতুম, ইনি একজন নতুন অচেনা ইয়ং জেণ্টেলম্যান, এর সামনেও সেকথা আমি অসঙ্কোচে বলতুম।··· ক্ষমা করবেন লেফটেনাণ্ট, আপনাকে তুচ্ছ করছি না—তবে খারাপ কিছু মনে হলে, আরাম কেদারায় বসে এমন করে সিগারের ফরমাশ করতে পারতুম না!

এই পর্যন্ত বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে ডাক্তার চোখ বুজলেন। নিমেষের জন্য, তার পর বললেন—এ পরিবর্তনের সম্বন্ধে চট্ করে কিছু বলা শক্ত! খুব শক্ত! তবু এটুকু থেকে যদি বোঝেন, শুনুন, আমি বলি—কোনো ডাক্তার যদি কোনো রোগীকে বহুকাল ধরে' চিকিৎসা করেন, তাহলে রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের মনের চমৎকার খানিকটা হৃদ্যতা জন্মায়। ডাক্তারকে দেখবামাত্র রোগীর মন খুশি হয়! আকর্ষণ নয় বিকর্ষণ—এমনি ভাব হয়! এমনও ঘটে, রোগী দেখে ডাক্তারকে ভিন্ন চোখে, ডাক্তারও দেখেন রোগীকে ভিন্ন চোখে। দুজনে যেন দুজনের মনকে অধিকার করে বসে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝবেন আরো ভালো করে'—ধরুন, আপনার টাইপ-রাইটার—একটা যন্ত্র—আপনি নিজে সেটা প্রত্যহ ব্যবহার করেন। ধরুন, হঠাৎ দশ দিনের জন্য আপনাকে বিদেশে যেতে হলো, টাইপ-রাইটার রইলো বন্ধ—ফিরে এসে টাইপ-রাইটার নিয়ে কাজ করতে বসলে সেটাকে খানিক নতুন বলে মনে হয় তো—এ ঠিক তেমনি আর কি! আরো একটা দৃষ্টান্ত। ধরুন, আপনি ঘোড়ায় চড়েন। নিজের ঘোড়া। সে ঘোড়ায় যদি আর কোনো লোক দু-চারদিন চড়ে তারপর সে ঘোড়ায় আপনি চড়লে ঘোড়ার চালে একটু অন্তত পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। এনার মধ্যে

আমি • তেমনি একটু পরিবর্তন আজ লক্ষ্য করেছি। তা যাক—লক্ষণ ভালো—এটুকু শুধু আপনি জেনে রাখুন।

চাকারবার্টি বললেন—আপনি বলেছিলেন নতুন রকমের কি ট্রিটমেণ্ট …

—সে ভার আমার, তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।… আমি এখনো সে সম্বন্ধে ভাবছি, আমার বিশ্বাস আমাদের চেষ্টা মিথ্যা হবে না! ব্যস্ …

তার পর বসে খানিকটা সঙ্গীত-চর্চা হলো। আমি গান গাইলুম—ডাক্তার ছাড়া সকলে শুনলেন—ডাক্তার মজুমদার একখানা মোটা বই খুলে কোণে বসে একাগ্র মনোযোগে তার পাতা উলটাতে লাগলেন—আমাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, নির্বিকার হয়ে।

গানের পর এলো তাস—এনা, মীরা আর আমি। খেলা হলো—

হাস্য কৌতুকে গল্পে গানে রাত্রি ন'টা বাজলো—এবার ডিনার। ডিনারের পালা চুকলে ডাক্তারের যাত্রার পালা। চাকারবার্টির মোটর হলো তৈরি। চাকারবার্টি বললেন—ওঁকে স্টেশনে পৌছে গাড়ি তোমাকে তোমার ব্যারাকে পৌছে দেবে কিরণ।

ডাক্তারের সঙ্গে মোটরে উঠলুম। ওঠবার সময় ডাক্তারের অলক্ষ্যে চাকারবার্টি আমার হাতখানা একবার শুধু চেপে ধরলেন—বুঝলুম, আমার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিলেন! মাথা নেড়ে জানালুম, হাঁ।

৭

পথে বেরিয়ে আকাশের পানে চাইলুম—আকশে কুয়াশা নেই, আধফালি চাঁদ একরাশ নক্ষত্র নিয়ে আমার গাড়ি চলেছে—গাড়ি চলেছে—চলেছে …

দুজনেই নিস্তব্ধ। খানিক পরে ডাক্তার মজুমদার বললেন—বুড়োর জন্য দুঃখ হয়। ও চায় আমি ওর এখানে দু-চারদিন থাকি, কিন্তু তা কখনো সম্ভব হয়? সেই এক প্রশ্ন করবে লক্ষ বার। ওর ব্যথা আমি বুঝি, কিন্তু এক কথার এক জবাব কত বার দেবো!—

পথের দুধারে গাছের সারি—উঁচু ডালপালায় পাতায় লতায় কে যেন আলো-আঁধারের জাল বুনে রেখেছে। ডাক্তারের কথার কি জবাব দেবো?—আমার জবাবের প্রত্যাশাতেও উনি ও-কথাগুলো বলেননি, ওকথাগুলো ওঁর বাঙলা-নাটকের স্বগত উক্তির মতো। চুপ করে রইলুম। ডাক্তার বললেন—এক একদিন এমন হয়েছে যে, বেচারীর প্রশ্ন আমি মোটে সহ্য করতে পারিনি। আমাদের প্রোফেশনে রোগ বা রোগী সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হয় না—সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় রোগীর আত্মীয়-বন্ধুরা। অসুখ হলে রোগী তো খুঁৎখুঁৎ করবেই—সব কিছুতেই তুলবে নালিশ—কোনো কিছু তার মনঃপূত হবে না। এগুলো হলো রোগের লক্ষণ। মাথা ধরলে টেম্পারেচার বাড়ে যেমন, ওগুলোও তেমনি। রোগীর অধৈর্যের মানে বুঝি, সে অধৈর্যের জন্য আমি সব সময়ে প্রস্তুত থাকি, কিন্তু রোগীর আত্মীয়-বন্ধুরা—রোগীর আড়ালে এসে তাদের অদ্ভুত এবং অজস্র অধীর প্রশ্ন—সেই সঙ্গে মিনতি—সত্য কথা বলুন ডাক্তার,

সারবে তো? আরে কি করে বলবো? ওরা ভাবে দুনিয়ায় তাদের ঐ রোগীটিই শুধু রোগ ভোগ করছে—ডাক্তার তাই সব ছেড়ে তাদের ঐ রোগীটিকে নিয়েই থাকুক। তা ছাড়া প্রশ্নের কি সংখ্যা আছে? এমন করলো কেন? অমন করলো কেন? কাল একটু বেশি ঘুমোলো কেন? পরশু পাশ ফিরলো না কেন? হুঁঃ, বোঝে না মেয়ে বলে' এনার জন্য ওঁর যে দুর্ভাবনা, এনার চিকিৎসার ভার নিয়ে এনার জন্য আমার ভাবনা তার চেয়ে বেশিই, কম নয়!

আমার বুকখানা ধ্বক্ করে উঠলো। ব্যাপার তাহলে সহজ নয়। ডাক্তারের কাছ থেকে যে খবর আমাকে আদায় করতে হবে, সে খবর অযাচিত ভাবে মিলে গেল! তবু বুকে ব্যথার ভার নিয়ে আমি প্রশ্ন করলুম—আমার বাচালতা ক্ষমা করুন ডাক্তার—আপনার কথায় আমি উদ্বিগ্ন হলুম।—মানে, এনার অসুখ তাহলে সারবার নয়?

—এনা!··· ডাক্তার যেন চমকে উঠলেন, বললেন—কিন্তু এনার সম্বন্ধে আমি তো কোনো কথা বলিনি। না-না, আপনি ভুল বুঝেচেন। এনা যেমন তেমনিই আছে—না ভালোর দিকে ফিরেছে, না মন্দর দিকে। অবস্থা যথাপূর্বং। দুঃখের কথা! এনা নয়—আমার ভাবনা বুড়ো চাকারবার্টিকে নিয়ে! এ ক'মাসে তিনি কতখানি বদলে গেছেন আপনি তো লক্ষ্য করেননি। কি বিশ্রী হয়ে গেছেন দিনে দিনে মানুষটা যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

আমি বললুম—আজ্ঞে না, আমি ওঁকে দেখছি শুধু এই হপ্তাখানেক মাত্র।

—ও, বটে বটে! তাহলে আপনি কি করে' বুঝবেন। ওঁর হাতখানা দেখবেন কি রকম সরু হয়ে গেছে। জীবন্ত মানুষের হাত অমন ফ্যাকাশে দেখা যায় না। ওঁকে তো বহুকাল থেকেই জানি।

কি জোয়ান ছিলেন—কি ভয়ানক খাটতে পারতেন! সেই মানুষ যেন মাটির পুতুলের মতো ঝরে ঝরে যাচ্ছে! কতবার মনে হয়েছে, ওঁকে একবার মেডিক্যাল এগজামিন করি কিন্তু পারিনি। যদি ভাবেন রোগ হয়েছে—তাহলে বাঁচানো দায় হবে! শুধু মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা—সে কি করে সেরে উঠবে, তার জন্য অধৈর্য। সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তা—নিজের বয়স হয়েছে, মারা গেলে মেয়েটি একেবারে অনাথ হবে—এইগুলোই হবে ওঁর মৃত্যুর কারণ এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি! এনা নয়—আমার দুশ্চিন্তা বুড়ো বাপের জন্য।

আতঙ্কে আমার গা ছমছম করে উঠলো। এমন কথা আমার মনে স্বপ্নেও উদয় হয়নি। আমার বয়স তখন পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর। একান্ত কোনো আপনজনের মৃত্যু চোখে প্রত্যক্ষ করিনি, তাই আমার সামনে একজনের জীবন দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, শিয়রে তার মৃত্যু—এ-চিন্তা বৃশ্চিকের মতো আমার মনকে দংশন করতে লাগলো। ভদ্রলোকের সান্নিধ্যে এই কটা দিনেই আমি তাঁকে ভালোবেসেছি, যেন আমার অত্যন্ত নিকট আত্মীয়; অমন কৃতী পুরুষ, অথচ কী অমায়িক ভদ্র আর দরদী, জীবনে দেখা দূরে থাকুক, এমন মানুষের কথা কোনো বইয়েও পড়েছি বলে মনে হয় না। আমি বললুম, এমন বনেদী ভদ্রলোক ···

আমাদের গাড়ি তখন এসেছে পার্কের সামনে—ডাক্তার মজুমদার বললেন—বনেদী! উঁহু—যা ভাবছো, তা নয়! চাকারবার্টির আজ অগাধ পয়সা—সে পয়সার জোরে মিস্টার হয়েছে—নাহলে গরীব গৃহস্থ-ঘরে ওঁর জন্ম—ওঁর পিতামহ সেকালে এ মুলুকে এসেছিলেন ভাগ্য-অন্বেষণে—ওঁর নাম অন্নদাবাবু। তারপর হঠাৎ—কিন্তু এসব কথা আমি ওঁর অমর্যাদা বা অসম্ভ্রম করবো বলে বলছি না—কৃতী

পুরুষ সন্দেহ নেই, সকল দেশের হঠাৎ-ধনীদের জীবনের সঙ্গে অন্নদাবাবুর জীবনের কোনো তফাৎ নেই।

সবিস্ময়ে আমি বললুম—বটে! কিন্তু আমি ভেবেছিলুম—

ডাক্তার মজুমদার বললেন—কথাটা আমার মুখ থেকে দৈবাৎ বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার অপরাধ নেই, অন্নদাবাবু আমাকে তোমার যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমার মনে হয়েছিল, ওঁদের সঙ্গে তোমার বহুকালের জানাশোনা, তুমি ওঁর সমস্ত কথা জানো, তাই অনুকম্পাভরে ওবাড়িতে তুমি যাওয়া-আসা করো। শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে, বেচারীর মাথায় হাত বুলিয়ে পাঁচজনে কিরকম লুটপাট করছে। যে যত বেশি দরদ জানায়, সে তত বেশি টাকাকড়ি ভোগা মারে! আর অন্নদাবাবু বিশ্বাসও করেন তাদের। এইটে সবচেয়ে আশ্চর্য! তোমাকেও আমি তেমনি একজন দরদী ভেবেছিলুম। যাক, আমায় ক্ষমা করো। আমি অত্যন্ত অবিচার করেছি তোমার উপর—অবশ্য না জেনে। তবে একথাও ঠিক, তোমাদের বা সেই মানুষের দরদ হয় সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ—অন্নদাবাবুর পাস্ট লাইফ সম্বন্ধে যে যাই বলুক, কিন্তু আমি ওঁকে খুব ভালো রকম জানি, ওঁকে শ্রদ্ধা করি আমি। ওঁর সম্বন্ধে যত মন্দ কথাই তুমি শোনো না কেন, ওঁর মন উঁচু বনেদী-ওলাদের চেয়েও উঁচু!

কথাগুলো আমার কাছে যেন হেঁয়ালি! তার প দুজনেই চুপচাপ—

গাড়ি ঢুকলো স্টেশনের কম্পাউণ্ডে। ডাক্তার ঘড়ি দেখলেন—বললেন চল্লিশ মিনিট দেরি আছে ট্রেন ছাড়তে—তোমার কাজ আছে, যেতে হবে। মিলিটারী রেগুলেশনস ··· এ্যা—

আমার মনে উদগ্র কৌতূহল, হেঁয়ালিটুকু যদি সাফ হতো—

ওঁদের সঙ্গে আমার মনকে বেশ মিশিয়ে দিয়েছি ক'দিনে ··· অন্নদাবাবুকে সত্যই ভালোবেসেছি। পরিচয়টুকু জানা থাকলে হয়তো—

বললুম—না, আমি নিমন্ত্রণে বেরিয়েছি, রাত এগারোটার মধ্যে পৌঁছলে চলবে।

—হুঁ! ডাক্তার বললেন—তাহলে গাড়িখানা রাখতে বলো।

—কিছু দরকার নেই! আমি টঙ্গা নেবোখন স্টেশন থেকে।

—এসো তাহলে ট্রেনের কামরায় বসে গল্প করি।

আমার প্রতিশ্রুতি—ডাক্তারকে প্রশ্ন করা বাকী! এই অবসরে সে প্রতিশ্রুতি পালন ···

সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় এসে বসলুম দুজনে। ডাক্তার বললেন—যে কথা মুখ ফশকে বলে ফেলেছি, তার জন্য অনুশোচনা হচ্ছে—ইঙ্গিত নয়—স্পষ্ট তোমার সব জানা দরকার এখন, নাহলে আমার মন্তব্যগুলো থেকে ওঁর সম্বন্ধে একটা বদ ধারণা জন্মাতে পারে।

ডাক্তার বললেন—গোড়া থেকেই বলা উচিত। গোড়ার দিকটায় অন্নদাবাবু ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ গরীব ঘরের ছেলে। সিড়িঙ্গে রোগা ছোকরা, কোন্ গাঁ থেকে বেনারসে আসে চাকরি-বাকরির চেষ্টায়। সিক্রাবাগের ছোট একটা হোটেলে কাজ করতো। সে হোটেলে জমায়েৎ হতো যত একাওয়ালা—সন্ধ্যার সময় খেনো মদ খেতে। বাপ যখন মারা গেল তখন ওর বয়স আঠারো-উনিশ বছর। হোটেলে একদিন দুজন খদ্দের মদ খেয়ে মারামারি করে, সে মারামারির জের থানা-কাছারি পর্যন্ত চলে। হোটেল গেল উঠে। অন্নদাবাবুর এমন পয়সা ছিল না যে নতুন করে হোটেল খুলবেন। ওঁর মা ছিলেন বুদ্ধিমতী, তিনি তরিতরকারি বেচে সংসার চালাতে লাগলেন। অন্নদাবাবু মোট বইতেন, যাত্রী ধরে ঠাকুর দেখাতেন। হিন্দী বেশ ভালোই জানতেন। সন্ধ্যার সময় এক উকিলের বাসায় গিয়ে নকলনবিসির কাজ করতেন। তাছাড়া, হিসাব-নিকাশে মাথা ছিল চমৎকার। ছোটখাট কটা দোকানে খাতা লিখে দুপয়সা কামাতেন। এত কাজকর্মের মধ্যে পড়ার অভ্যাস রেখেছিলেন সমানে। বাড়িতে বসে পড়বেন—তেল কেনবার সামর্থ্য ছিল না, রাত্রে ছাড়া পড়ার সময় পেতেন না তো—পথে বসে পথের বাতির আলোয় পড়াশুনা করতেন। পুরোনো ছেঁড়া খবরের কাগজ পড়ার ঝোঁক ছিল অসাধারণ রকম। খবরের কাগজ পেলে তার কোনো লাইন পড়া বাকী থাকতো না। এমনি ভাবে দুনিয়ার খবর ছিল তার

নখদর্পণে! বহু ভদ্রলোক বলতেন—এ ছেলে অসাধারণ একজন মানুষ হবে …

অন্নদাবাবু কাশী ছেড়ে জৌনপুরে আসেন। কি করে' এলেন আমি তা জানি না। বাইশ বছর বয়সে জৌনপুরে বেশ নামজাদা ব্যবসাদার বনে বসলেন। ব্যবসা করতেন কাঁচা মালের—ডালচাল থেকে চামড়া-কাঠ পর্যন্ত কোনো জিনিস বাকী রাখেননি, সব কাজের কাজী বলে' নাম হলো। ক'টা বড় চিনির খারখানার দালালীও যোগাড় করেছিলেন। তখন বাঙালী-পশ্চিমী নিয়ে কোনোরকম প্রভিন্সিয়ালিজ্‌ম্‌ ছিল না, বহু ব্যবসায়ীর সঙ্গে হলো অন্তরঙ্গতা; কেউ চায় কলকাতায় মাল-চালানী কাজ করতে, হদিশ জানে না, অন্নদাবাবুর স্মরণ নিলে। অন্নদাবাবু ভালো ব্যবস্থা করে দিলেন। এসব ছাড়া আর একটা ব্যবসা খুলেছিলেন—পুরোনো জিনিসপত্র বিক্রী করা। এর জন্য মাল আমদানি করতেন ওদিকে কলকাতা, পাটনা, কাশী থেকে; এদিকে কানপুর, এলাহাবাদ থেকে যায় বোম্বাই, পুনা, দিল্লী, লাহোর, লুধিয়ানা, অমৃতসর পর্যন্ত। তার উপর ছিল ঘোড়ার দালালী, বাড়ির দালালী, লাইফ ইনস্যুরেন্সের এজেন্সি। অদ্ভুত রকম লোক, যেটায় হাত দেন, লক্ষ্মী এসে হাতে ভর করে বসেন।

ডাক্তার বলতে লাগলেন—এমন যার জেদ, এতখানি যার উৎসাহ, সে মানুষ যে টাকার আণ্ডিল জমাবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। খরচ সম্বন্ধে হাত ছিল দরাজ—কারো ছেলের লেখাপড়া হচ্ছে না—কেউ কন্যাদায় বিব্রত—কারো ভিটেজমি বিক্রী হচ্ছে ডিক্রীর দায়ে—অন্নদাবাবুর কাছে সাহায্য চাইবামাত্র তিনি টাকা দিতেন। অর্থাৎ তাঁর কাছে কোনো প্রার্থনা জানিয়ে কেউ অখুশি মনে শুধু হাতে ফিরে আসেনি। অসহ্য দারিদ্র্যে একদিন তিনি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছেন,

কখনো দমেননি! আর জীবনে ওঁকে আমি কারো উপর বিরক্ত হতে দেখিনি! যাক, লক্ষ্মীকে উনি আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছেন, কিন্তু লক্ষ্মীকে পেলেই কি মানুষের সব পাওয়া হয়? আমরা ডাক্তাররা ভালো করেই বুঝি। দেখি তো ব্যাঙ্কে মোটা তহবিল, যখন যা চায়, হাতের নাগালে পাচ্ছে—এতেও মানুষ সুখী হয় কই? অন্নদাবাবু খুবই গরীব ছিলেন, টাকা ছিল কাম্য, তবু টাকাটাকেই তিনি জীবনের পরম লক্ষ্য করেননি—কোনো কালে নয়। ঐ যে বলেছি, পড়াশুনায় অসম্ভব ঝোঁক, পৃথিবীর সব কিছু জানবার জন্য বিপুল আগ্রহ, তাঁর পণ—সব জ্ঞান আয়ত্ত করবেন। ট্রেনে সারারাত ওঁর সঙ্গে পাড়ি দিয়েছি, দেখেছি একমিনিট ঘুমোননি। ট্রেনের সীটে ঠেশ দিয়ে বসে বই পড়েছেন। কারবারের কাজ থেকে একটু অবসর মিলেছে, অমনি দেখেছি, বই নিয়ে বসেছেন। তাও নাটক-নভেল নয় তোমাদের এযুগের, থ্রীলার নয়, সাইন্স, ফিলজফি, একনমিক্স, কমার্স, ইণ্ডাষ্ট্রিজ—এইসব বই! আইন, আর্ট, ডাক্তারী এগুলোতেও চমৎকার ওঁর জ্ঞান। বোম্বাইয়ে, আমেদাবাদে, লাহোরে দিল্লীতে, কলকাতায় বড় বড় নিলাম হয়েছে, সেখানে ঠিক উনি ছুটে গেছেন। বেছে বেছে অদ্ভুত সব জিনিস কিনেছেন। ব্যাঙ্কিংয়ে কিরকম সূক্ষ্ম আর দূরদৃষ্টি, এমনটি আমি কারো দেখিনি আর। এই কারণেই যে কাজে অন্নদাবাবু হাত দিয়েছেন সোনা ফলিয়েছেন! কত ক্ষেত-খামারের মালিক উনি। আমি মাঝে মাঝে বলি—পরমায়ু যদি পাঁচশো বছর পেতেন, অন্নদাবাবু তাহলে অর্ধেকটা পৃথিবী বুঝি হাত করতেন! তবে গরীব ঘরে জন্ম বলে, আজ ক্রোড়পতি হয়ে যে খাতির পান তাতে ওঁর মন ভরে না; বলেন, মানুষকে কেউ দেখে না, ডক্টর মজুমদার, মানুষের ওজন করে সকলে টাকার বাটখারায়!

সরকার থেকে ওঁকে 'স্যার' টাইট্‌ল্ দেওয়ার সব ঠিক, উনি হাতে পায়ে ধরে মিনতি জানিয়ে নিবৃত্ত করেন—না, বড় লজ্জা পাবেন তাহলে।

ডক্টর মজুমদার বলতে লাগলেন—এ সব কথা যা বললুম, তা লোকের মুখে শোনা—এর পরে যা বলবো তা আমার শোনা অন্নদাবাবুর মুখ থেকে। ওঁর স্ত্রীর একটা অপারেশন হয়—সাংঘাতিক অপারেশন। অপারেশন হয় আমার নার্শিং হোমে। অপারেশনের পর উনি আর আমি দুজনে একটা ঘরে বসেছিলুম, রাত দশটা থেকে ভোর পর্যন্ত—সারারাত জেগে—কাজেই এ কাহিনীর গোড়ার দিকটা কতখানি সত্য আর কতখানি অতিরঞ্জিত, বলতে পারি না। তবে এবারে যা বলছি, তা খাঁটি সত্য, কারণ যে সময়ে অন্নদাবাবু আমাকে এ কথা বলেন, সে অবস্থায় মানুষ মিথ্যা বলতে পারে না।

ডক্টর মজুমদার একটা সিগার ধরালেন। সিগারে কটা টান দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, এবারে শোনো কি করে উনি ক্রোড়পতি হলেন।

—এবং জৌনপুর থেকে এই লক্ষ্ণৌয়ে এলেন। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে উনি আসেন লক্ষ্ণৌয়ে। নবাবীআমলের কটা পুরোনো বাড়ী কিনলেন—মাথার সামনের দিকের চুলগুলোয় তখন বেশ পাক ধরেছে। সারা দিন নানা কাজে ব্যস্ত, রাত্রে ঘণ্টা দুই শুধু ঘুম। ট্রেনে ট্রেনে ঘোরা, রোজগার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের দিকে লক্ষ্য বাড়ছে, ট্রেনে একা যখন ট্রাভ্‌ল্ করতেন, তখন ঐ থার্ড ক্লাশ! থার্ড ক্লাশ ছেড়ে কখনো ইণ্টারে ঢুকতেন না। প্রশ্ন করলে বলতেন—আমি যে দরের মানুষ, থার্ড ক্লাশ ছাড়া উঁচু ক্লাশ আমার সাজে না। থার্ড ক্লাশে কাঠের শক্ত বেঞ্চে জীর্ণ একখানা র‍্যাগ পেতে তাতে পড়ে গড়ানো ···

থার্ড ক্লাশের কোণ অধিকার করে' বসতেন। কোণ নেওয়ার কারণ, ঠেস দিয়ে বসে ঢুলতে পারবেন।...

একবার এমনি ট্রেনে চলেছেন। কোণে বসে ঢুলছেন, কামরায় বহু লোক, কাজ-কারবারের কথা কইতে কইতে চলেছে। তাদের কথা উনি শুনছেন সাগ্রহে খবর সংগ্রহের জন্য। উনি চিরদিন থাকেন উৎকর্ণ! গভীর রাত, ঢুলুনির জন্য কামরার কাঠে মাথা ঠুকছে, সঙ্গে সঙ্গে চমক হচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ কানে ঢুকলো টাকার কথা! ঐ কথাটুকু শোনার ফলে অন্নদাবাবু সে যাত্রায় মবলগ ষাট হাজার টাকার মালিক হলেন।

ষাট হাজারের একটা পয়সা কম নয়! কি করে'? অলৌকিক ব্যাপার : এ কথা কানে যাওয়া মাত্র তাঁর নিদ্রালু ভাব গেল কেটে! এ ষাট হাজার টাকা কি করে' মিলবে? চিন্তায় আকুল হলেন। ট্রেনের সহযাত্রীরা তাঁর এ বাসনা বা আগ্রহের এতটুকু আভাস পেলো না। উনি যে ঢুলতে ঢুলতে ওদের কথা শুনেছেন, তাও তারা জানে না।

যে-মানুষটি ঐ ষাট হাজারের কথা বলছিল, পঁচিশ-ত্রিশ বছর সে এলাহাবাদের এক উকিলের মুহুরিগিরি করেছে। ঝানু মুহুরি। সে উকিল মারা যাওয়ার পর এক জুনিয়রের কাছে কাজ করে। মানে জুনিয়রকে চরিয়ে খায়। মুহুরি বলছিল, গাজীপুরে এক বাঙালী জমিদার ছিলেন, অগাধ পয়সা, নাম নিত্যানন্দ সেন। তিনি মারা গেছেন প্রায় তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর আগে—বিধবা স্ত্রী, নিঃসন্তান, আর বাঙলা মুল্লুকে এবং পশ্চিমের নানা জায়গায় নিত্যানন্দর অনেক জ্ঞাতির বাস, বিধবা স্ত্রী সত্য মারা গেছেন, মারা যাওয়ার আগে মুহুরির ঐ জুনিয়ার উকিলকে দিয়ে উইল লিখিয়ে গেছেন। উইলে আত্মীয় জ্ঞাতিদের মধ্যে কাউকে একটি পয়সা দিয়ে যাননি, যথাসর্বস্ব, মানে প্রায় তিন-চার

লক্ষ টাকার সম্পত্তি,—দিয়ে গেছেন, তাঁর সেবা করতো একটি বাঙালী দাসী—সেই দাসীর বিশ-পঁচিশ বছরের বিধবা মেয়ে কাত্যায়নীকে। মুহুরীর উকিল সে উইলের প্রোবেটের ব্যবস্থা করলে নিত্যানন্দর যে যেখানে জ্ঞাতি ছিল, ওয়ারীশান-সূত্রে কোর্টে আপত্তি জানালো। ও উইল জাল, বাতিল করে' তাদের দেওয়া হোক—বাটোয়ারা করে' সম্পর্কের নৈকট্য ধরে'! নীচের আদালতে জ্ঞাতিরা গেল হেরে; তাতেও কিন্তু দমলো না। এলাহাবাদ হাইকোর্টে করলো আপীল,। আপীলের শুনানি এখনো হয়নি। বুড়ী-দাসী অন্ধ, তার মেয়ে কাত্যায়নী গোবেচারী। এত টাকাকড়ি সে চায় না, অথচ মামলামকর্দমা—সে যেন হাঁফিয়ে মরবে, এমন অবস্থা। এমন সময় বাঙলা মুল্লুকের দুই জ্ঞাতি তাকে হাত করে' লোভ দেখিয়েছে, দুজনে কাত্যায়নীকে তিরিশ তিরিশ ষাট হাজার টাকা—সে ও-আপীলে উকিল না দিয়ে হাজির থাকবে, ব্যস্ ···

ডাক্তার মজুমদার বললেন,—অন্নদাবাবু এ কাহিনী শুনলেন নিঃশব্দে, শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিষয়-বুদ্ধি হলো প্রখর। যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে না গিয়ে তিনি চুপিচুপি হাজির হলেন গাজীপুরে। এবং স্টেশনের প্রায় গায়ে-লাগাও এক হোটেলে স্নানাহার সেরে সটান গিয়ে উঠলেন একায় চড়ে গাজীপুরে নিত্যানন্দর গৃহে!

প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। অথচ নিথর নিঝুম। রূপকথার পাতালপুরীর মতো, হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করার পর ঐ কাত্যায়নীই এসে সদর দরজা খুলে দিলে। কাত্যায়নী সুন্দরী নয়, দেখতে রোগা, পরনে সেমিজের উপর একখানি রঙীন শাড়ি।

তাকে দেখে অন্নদাবাবু বুঝলেন, ইনিই এ বিপুল সাম্রাজ্যের মালিক। বললেন, অনেকক্ষণ ধরে দরজা ঠ্যাঙাচ্ছি, তা রামলাল কোথায়?

কাত্যায়নী বললে—রামলাল! রামলাল বলে তো কেউ এখানে থাকে না।

অন্নদাবাবু বললেন—সে কি, কথা দিয়ে সে গর-হাজির!

কাত্যায়নী নিরুত্তর। অন্নদাবাবু বললেন—আমি এ বাড়ী দেখতে এসেছি! রামলাল এইখানেই থাকে। বললে—দিদিমণি মামলা-মকর্দমার জন্য কাতর, উইল-টুইল কিছু চায় না। উকিলরা গায়ে পড়ে মুকর্দমা করাচ্ছে। দিদিমণি দু-চার হাজার টাকা পেলে সব বেচে পালাতে পারলে বাঁচে। আমি তাই বাড়ী দেখতে এসেছি।

কাত্যায়নীর দু'চোখে বিস্ময়, বললে—কিন্তু কোনো রামলালকে তো চিনি না।

অন্নদাবাবু বললেন—আমার মনে হচ্ছে তুমিই সেই দিদিমণি—উইলে যে …

ঘাড় নেড়ে কাত্যায়নী বললে—হুঁ!

অন্নদাবাবু ক্ষণেক স্তম্ভিত, রাজরাজেশ্বরী তাঁর সামনে। অন্নদাবাবু তখন যথাসম্ভব বিনম্র কণ্ঠে বললেন—মাপ করবেন, আমি গোড়ায় বুঝতে পারিনি। তা আমি আসছি এলাহাবাদের বড় আদালত থেকে, হাকিমের হুকুমে, আপনাকে বারণ করতে, খবর্দ্দার আপনি বাট হাজার টাকা নিয়ে আপীল কাটিয়ে দেবেন না—তাহলে' হাকিম বলেছেন, তিনি আপনাকে আর আপনার মাকে জেলে দেবেন। কোনো উকিলকে বাড়ীর চৌকাট পেরোতে দেবেন না, কারো সঙ্গে দেখা করবেন না, বা উইলের ব্যাপার নিয়ে কথা কইবেন না। হাকিম যদি জানতে পারেন, তাহলে বিশ বছর করে' মেয়াদ। আমাকে হাকিম পাঠিয়েছেন এখানকার সব তদারক তদন্ত করতে। আমি বাড়ী ঘর দেখবো। বেচারী কাত্যায়নী একথা শুনে থ। অন্নদাবাবুকে

সাদরে ভিতরে নিয়ে গেল। অন্নদাবাবু বললেন—সদর বন্ধ করো। আমি এসেছি এ কথা কাকপক্ষীতে না টের পায়, টের পেলে ঐ বদমাশ ব্যক্তিরা আপনাকে আর আপনার মাকে খুন করতে পারে। হাকিম বলে' দিয়েছেন—বেচারী অবলা মেয়েমানুষ, তাই আমায় হুকুম দিয়েছেন, আপনাদের দেখাশুনা করবার জন্য। বুঝলেন?

এই পর্যন্ত বলে' ডাক্তার হাসলেন। বললেন—রূপকথার মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু রূপকথা নয়। অন্নদাবাবু নিজে থেকে এ কাহিনী আমায় বলেছেন এবং যে অবস্থায় বলেছেন, সে-অবস্থায় অতিবড় বদমাশও মিথ্যা কথা বলতে পারে না। সিগারটা নিবে গিয়েছিল, জ্বালালেন—জ্বালিয়ে দু-চারটে টান দিয়ে আবার আরম্ভ করলেন—অন্নদাবাবুর কথায় বেচারী কাত্যায়নীর মনে হলো, অকূলে যেন কূলের সন্ধান পেলেন! তিনি বললেন—হাকিমের খুব দয়া! না হলে আমি এমন ভাবনায় পড়েছি, উকিলবাবুরা নিজে থেকে আসছেন, মামলা-মকর্দ্দমা করছেন। গিন্নীমা যে উইল করে' গেছেন, সে উইল নিয়ে আদালতে ঝামেলার শেষ নেই। উকিলবাবু নিজে থেকে খরচ দিয়ে যা করছেন। হাকিম সাহেব যখন আপনাকে পাঠিয়েছেন, আপনি দেখুন শুনুন। গিন্নীমার আমি কোনো মন্দ করিনি, কেন তিনি আমায় এমন গেরোয় ফেলে গেছেন বুঝি না। সকলে বলছে, লাখ টাকার বিষয়, জমিদারী, কাজ-কারবার, রাজার ঐশ্বর্য। সত্য বলছি আপনাকে, এসব আমি চাই না। বুঝিও না এসবের অর্থ! আমায় দু-পাঁচ হাজার টাকা দিলেই আমি আমার গাঁয়ে চলে যাই। হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত হবো যে জীবনে অন্নবস্ত্রের ভাবনা ভাবতে হবে না।

কথা শুনে অন্নদাবাবু যেন পাগল হবেন, এমন অবস্থা। তিনি ভাবলেন, এ রকম মুখ্যু মেয়েমানুষ, একে ভয়ানক সাবধানে রাখা

চাই—কোরো সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া নয়। যে-কেউ অনায়াসে একে হাত করে' সর্বস্ব নেবে লিখিয়ে। তিনি বললেন—হ্যাঁ, তাই করা যাবে, আপনার কোন কষ্ট হবে না। তবে খুব সাবধান, আপনি সরল মানুষ, বিপদের ঘোর-প্যাঁচ জানেন না। দুষ্ট লোকেরা নানা কথায় ভুলিয়ে আপনাকে পাগল করে' দিতে পারে। খবর্দার মামলা-মকর্দ্দমা মেটাবেন না। উকিলবাবুদের সঙ্গেও আপনি দেখা করবেন না! আপনার গিন্নীমার যিনি সব দেখাশুনা করতেন, তাকে ডাকিয়ে সেরেফ বলে দেবেন, যা-কিছু করতে হবে, আমার সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করে করেন যেন। তাহলে আমি এমন ভাবে ব্যবস্থা করবো যাতে আপনার পায়ে কাঁটাটি ফুটবে না, অথচ সারা জীবন আরামে যাতে থাকতে পারেন; কোনো ঝক্কি না পোহাতে হয়, আমি তার সব ব্যবস্থা করে দেবো।

কাত্যায়নী দেবী বললেন—আপনি আমায় বাঁচালেন।

অন্নদাবাবু বুঝে নিলেন সব। দাসী মানুষ, চিরদিন পরের আশ্রয়ে পরের অধীনে ফরমাশ খেটে কাটাচ্ছে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার না আছে সামর্থ্য, না আছে সাহস। চারি দিক থেকে কত রকম মানুষ এসে কত রকমের ধোঁকা দিচ্ছে, কত ফাঁদ পাতছে, ভয়ে বেচারী আকুল হয়ে আছে! তিনি বললেন—রাজার রাজ্য, তা নিয়ে লড়াই যুদ্ধ চলে কম! আপনার এ বিষয়-আশয়—এ'ও রাজার রাজ্যের সামিল তো, তা কোনো ভয় নেই, আপনি থাকলেন বাড়ীর অন্দরে, আমি থাকবো সদরে, কাউকেও আমি আপনার কাছে ঘেঁষতে দেবো না, হাকিমের কাছে রোজ গিয়ে খবর দেবো, যাতে শীগগির শীগগির সব গোলমাল মিটে যায়। আপনি শান্তি পান। উকিলগুলো—হুঁ, আমি ওদের জানি তো, ওরা

মানুষ নয়—মানুষ-খেকো বাঘ! মকদ্দমা বাধিয়ে দেয়, নিজের তাতে লাভ আর যারা মকর্দ্দমা করতে নামে ওদের পরামর্শে, তারা শেষে ভিখিরী হয়ে দাঁড়ায়! আমি থাকতে পাঁচ ভূতে আপনার সর্বস্ব লুটে খাবে, সেটি হতে দেবো না!

কাত্যায়নী দেবী বললেন—এসব জঞ্জাল থেকে আমায় বাঁচান আপনি হাকিমকে বলে—হাকিমকে বলে এ সব আপনি বেচে দেন। বেচে ঐ যা আমি বললুম, আমায় দু-পাঁচ হাজার টাকা দেবেন, আমি কাশী কিম্বা বৃন্দাবনে গিয়ে থাকবো।

ডাক্তার বলতে লাগলেন—কাত্যায়নী দেবীর ঐ ছোট্ট কথাটুকু—অন্নদাবাবুর মনে হয়েছিল, ও কথার দাম কোহিনুর মণির মতো! আগেই বলেছি, এ কাহিনী অন্নদাবাবু আমায় বলেছেন—এবং এমন এক ক্ষণে বলেছেন—মানুষের জীবনে যেটি হলো চরম ক্ষণ! এমন চরম ক্ষণ, যে ক্ষণে অতিবড় গম্ভীর মানুষও মনের মধ্যে যদি কোনো জঞ্জাল, কোনো আবর্জনা জমিয়ে রেখে থাকে তো সেগুলো বার করে দিতে চায়। সে চরম ক্ষণে অন্নদাবাবুর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়—সে সময় কি গভীর আবেগে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে এ কাহিনী বলেছিলেন! তিনি বলেছিলেন—কাত্যায়নী দেবীকে মুঠোর মধ্যে বেশ করে' চেপে তিনি কেবলি নিজেকে সতর্ক করছিলেন, হুঁশিয়ার! নিজের দুরভিসন্ধি না প্রকাশ পায়, নিজের লোভ কাত্যায়নী দেবীর কাছে আভাসে না ব্যক্ত হয়ে পড়ে!—খুব সাবধানে চাই ঠিক-সময়ে ঠিক টোপটি ফেলা! কাত্যায়নী দেবীর এ সন্দেহ না হয় যে, গরজ অন্নদাবাবুর! তিনি নিঃশব্দে বিক্রী কোবালা লিখিয়ে সই করিয়ে নিলেন—দশ হাজার টাকায় কাত্যায়নীর উইলের সর্বস্বত্ব! বাড়ীতে রেজিস্ট্রার আনিয়ে সে দলিল হলো রেজিস্ট্রী, কাছারিতে হাকিমের সঙ্গে পরামর্শ করতে যাচ্ছেন বলে বেরুতেন—দলিলপত্র তৈরি করানো—দশ হাজার টাকা যোগাড় করে আনা—বেরুতেন অন্দরে কাত্যায়নী দেবীকে একরকম বন্দিনী রেখে—অর্থাৎ সদরের দরজাগুলোয় তালা লাগিয়ে।

তদ্বিরের জোরে প্রোবেটের মামলা আপীল ইতিমধ্যে শেষ করিয়ে নিয়েছিলেন। দশহাজার টাকা নিয়ে কাত্যায়নী দেবী যেদিন বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন, তার আগের দিন অন্নদাবাবু মোক্ষম চাল চাললেন, বললেন—এত টাকা নিয়ে চলে যাবেন, আমার ভরসা হচ্ছে না। যে রকম সরল মনের মানুষ—তা চোর আছে, ধাপ্পাবাজ আছে—তীর্থে তাদের সংখ্যা আরো বেশি এবং বাঙালী মেয়েদের ধর্ম-কাঙাল মনকে ঠকানোর কাজ খুবই সহজ। অতএব—

তিনি মরিয়া হয়ে প্রস্তাব করলেন—আপনি যেমন অসহায়, তেমনি ভালোমানুষ, আমারো সংসার শূন্য—যদি আমরা বিবাহ করি, সংসার হবে, সুখ শান্তি ··· ছেলেবেলায় বিধবা হয়েছিলেন কবে ··· বিধবার বিবাহও অচল নয়···

এমনি নানা কথার সঙ্গে নিজের জীবনের শূন্যতা প্রভৃতির কথা তুলে দুটো নিশ্বাস, দুটো ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা—কাত্যায়নী দেবী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হলেন। এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহও হলো। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কাত্যায়নী দেবীর জীবনের ওদিকটা ছিল শূন্য, কাজেই—মানে, যাঁরা সাইকলজির চর্চা করেন, তাঁরা এতে এতটুকু বিস্মিত হবেন না।

প্রস্তাবটা করবামাত্র অন্নদাবাবু বলেছিলেন, তাঁর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠেছিল, শিরায় শিরায় যেন কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল—জ্বরের উত্তাপ সারা দেহে! মনে হয়েছিল, তাঁর নাড়ীর স্পন্দন বুঝি নেমে যাবে এবার! তাঁর চেতনাও বিলুপ্ত হয়ে এসেছিল যেন!

চেতনা ফিরলো কাত্যায়নী দেবীর কণ্ঠস্বরে, সে কণ্ঠে রাজ্যের আরম্ভ!

ডাক্তার মজুমদার আবার চুপ করলেন—করে' ঘড়ি দেখলেন,

বললেন—এখনো আঠারো মিনিট—সংক্ষেপে সেরে নি। মানে, বিবাহ করে দুজনেই বেশ সুখী হয়েছিলেন। কাত্যায়নী দেবীর যেমন স্বামিগত প্রাণ, অন্নদাবাবুরও তেমনি ঐ স্ত্রী ছিলেন সর্বস্ব! যত প্রবঞ্চনা করেই তিনি সম্পত্তি আর স্ত্রীকে হস্তগত করুন—স্ত্রীর উপর তাঁর ভালোবাসা আর নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ রকম—কাব্যে নাটকেও এমন ভালোবাসার কথা পড়া যায় না!... বেচারী দাসীবাঁদীকে ফন্দীবাজী করে ঠকানো—এইটুকু ধরে অন্নদাবাবুর বিচার করো না লেফটেনাণ্ট, মানুষটির সঙ্গে আমি ভালো রকম মিশেছি, এমন কোমল মন—এমন দরদ, আমি আর কারো দেখিনি! ঐ মেয়েটির জন্ম হলো—সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর মৃত্যু। আমার ওখানে—আমার নার্শিং হোমে এনার জন্ম আর কাত্যায়নী দেবীর মৃত্যু! এনা ওঁর সর্বস্ব! এনাকে কেউ যদি সুস্থ করে দেয়, তাহলে তাকে উনি ওঁর যথাসর্বস্ব দান করতে পারেন। মেয়েকে এমন ভালোবাসেন। যে-কদর্য মন নিয়ে তঞ্চকতায় রাজ্য-ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছিলেন, সে কদর্যতার বাষ্পও কেউ ওঁর মনে খুঁজে পাবে না! আজ বেচারী গভীর হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে। দারুণ আত্মগ্লানি—কাত্যায়নীর সঙ্গে যে ফন্দীবাজী করেছেন,—তখনি তাঁকে বিবাহ করে, অন্তর-ভরা ভালোবাসা দিয়ে সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয় হয়নি—তাই ক্যাত্যায়নী চলে গেলেন, মেয়েটিকে অন্নদাবাবুর হাতে রেখে—একথা বার বার আমায় বলেচেন। নিজে এতটুকু বিলাসিতা করেননি—মোটা খাওয়া, মোটা পরাতেই খুশি চিরদিন। বাড়ীতে যে বিলাস, যে-শৌখিনতা দেখচো, এগুলো শুধু মেয়ের জন্ম। ঐ সঙ্গে মনে মনে কাত্যায়নী দেবীকে স্মরণ করে' প্রত্যহ বলেন—আমার সে পাপ ক্ষমা করো। পাপে যে বিষয়সম্পত্তি আহরণ করেছি—সে সম্পত্তি তোমার ঐ মেয়ের সুখে উৎসর্গ করা ছাড়া আমার

অন্য উদ্দেশ্য নেই। অদ্ভুতচরিত্র নয় কি? আচ্ছা সংক্ষেপে এবার পরের কথাগুলো সেরে নি—প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা বলবার প্রয়োজন নেই। শুধু ভেবে দেখো, তুচ্ছ একজন নগণ্য মানুষ ··· এটা-সেটা কেনা-বেচা করে' দালালী করে' খায়—এতবড় সুযোগ ছাড়া তার পক্ষে কতখানি অসম্ভব!··· বড় বড় অভিযানে যে-সব দিগ্বিজয়ী বীর পৃথিবীর আধখানা জয় করেছেন, তাঁদের লোভ আর বেচারী অন্নদাবাবুর লোভ—এ দুয়ে আমি কোনো তফাৎ দেখি না! সার্‌ভাইভাল অফ দী ফীটেস্ট—ভারী খাঁটি কথা! এ সম্পত্তি তিনি শুধু রক্ষা করছেন, লালন করছেন—ট্রাস্টের মতো—মেয়ের জন্য! উনি জানেন, জীবনে উনি শান্তি পাবেন না ···

কাত্যায়নী দেবীর মৃত্যুতে অন্নদাবাবু ভেঙ্গে পড়েছিলেন, কাজকর্মে ঔদাস্য, জীবনে ঔদাস্য, কিন্তু দুদিন শুধু। তারপর মেয়েকে কেন্দ্র করে' জাগলো আবার নতুন করে জীবন-প্রবাহ! কাজে উৎসাহ বাড়লো, কারবার দেখাশোনা—টাকার পাহাড়ের উপর আবার পাহার তোলা! যে-টাকার ধ্যানে যৌবন কাটিয়েছেন সে টাকার ধ্যানে আবার হলেন তন্ময়।—টাকা আর মেয়ে—এ ছাড়া তাঁর দুনিয়ায় আর কিছু নেই! মেয়েও রূপেগুণে দিনেদিনে ঐশ্বর্যময়ী হয়ে উঠছিল—যেমন শান্ত ধীর স্বভাব, তেমনি মায়া-মমতা! এতবড় ধনীর কন্যা, তার জন্য আচারে ব্যবহারে এতটুকু জাঁক নেই, দেমাক নেই! মায়ের শান্ত স্বভাব আর বাপের বুদ্ধি মেয়ে পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে! লেখাপড়ায় যেমন মন, গানে বাজনায় তেমনি অনুরাগ—বাপের দৌলতে সে-অনুরাগ, সে মন কোনো সুযোগে বঞ্চিত হয়নি!

কিন্তু বেচারীর ভাগ্য মন্দ—পনেরো বছর বয়সে মেয়ের কি-রোগ

যে হলো—জ্বর, বাত। একটি বছর শয্যাগত। কলকাতা বোম্বাই থেকে বড় বড় ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসায় জ্বর সারলো আর উপসর্গ সারলো, কিন্তু কোমর থেকে নীচের অঙ্গ একদম অবশ অসাড়! সুইজার্ল্যাণ্ডে যাবেন, জার্মানিতে যাবেন মেয়েকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য, কিন্তু ভরসা হয় না। তিন বছর আগে আমাকে ধরেন। সেই অবধি আমি দেখছি! নিজে উনি বড় বড় ডাক্তারী বই আনাচ্ছেন বিলেত থেকে—পড়েন যদি কোনো হদিশ পান—ব্রিটিশ মেডিকেল জর্নাল, ওঁর কাছে আছে তার কম্‌প্লিট সেট, আর ডাক্তারী বই ওঁর লাইব্রেরিতে যেমন আছে, এমন কোনো বড় ডাক্তারের লাইব্রেরিতেও পাবে না!

আমি এত কথা তোমাকে বললুম, গশিপ বলে নয়, মানুষটার সঙ্গে তুমি মেলামেশা করছো, বাইরের কোনো লোকের মুখে ওঁর ঐ সম্পত্তি লোটার কাহিনীটুকু শুনে ওঁকে অশ্রদ্ধা না করো, ওঁর উপর অবিচার না করো—শুধু এই কারণে!

স্তব্ধ হয়ে শুনলুম এ কাহিনী, আমার মাথায় যেন ঘূর্ণি চলেছে! কোনোমতে প্রশ্ন করলুম—মেয়ে সারবে না?

ডাক্তার বললেন—সারবে না, এমন কথা বলবো না। রোগ মাত্রেই সারে, তবে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। রোগের জড় নির্ণয় করতে পারি না—অন্ধকারে হাতড়াতে থাকি, তাই প্রতিকারের হদিশ পাই না। ঢিল ফেলতে ফেলতে কোনোটি যদি লাগে ··· জানো, বাইশ বছর আগে, তখন আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি থার্ড ইয়ার, আমার জানা দিব্যি এক জোয়ান সুস্থ ব্যক্তির হলো কঠিন ব্যাধি! ডাক্তাররা নানা জনে নানা ডায়াগনসিশ করলেন। কেউ বললেন, মালিগনাণ্ট টাইপ অফ্ ডায়বেটিশ—মানে, বাহিরে কোনো

উপসর্গ নেই, শরীর দিনে দিনে ক্ষয় হচ্ছে, কোনো খাবার মুখে রোচে না। বাইশ বছর আগে চিকিৎসাশাস্ত্রের শৈশবে, আমার কিন্তু জেদ চাপলো, লক্ষণ বুঝে বই হাতড়ে দেখি, যদি কিছু ঠাওর পাই! বিশ্বাস করবে না হয়তো, আমি বইয়ের সন্ধানে কলকাতায় গেছি—পুনায় গেছি, লাহোরে গেছি—ঐ কেসটার জন্ম—রোগের হদিশ মেলেনি কিন্তু একটা জ্ঞান সেই থেকে লাভ করেছি—সে জ্ঞান হলো—ইনকিউরেব্‌ল্ বা শিবের অসাধ্য বলে কোনো রোগ দুনিয়ায় নেই!

প্রশ্ন করলুম—সে ভদ্রলোক সেরে উঠেছিলেন?

—না। ডাক্তার মজুমদার বললেন—একবছর বেঁচে ছিলেন! কিন্তু ওকথা থাক, অন্নদাবাবুর মেয়ে এনার কথা বলি। সময় সংক্ষেপ, এনার কিছু উন্নতি হয়েছে কি—হাঁ। আজ সে উন্নতি আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি!... তবে আমার চিকিৎসাও হাতুড়ের মতো—হুঁ—শুধু অন্ধকারে চোখ বেঁধে ঘুরছি—কিচ্ছু পাচ্ছি না। তবু মজা জানো, Nature helps in deception we practise on patients. অটো সাজেশন মানো? তার ফল—অনেক সময় হয় অসাধারণ রকম।

বললুম—কিন্তু শুনেছি, হাঁটাবার কি যন্ত্র দিয়ে আপনি এনাকে হাঁটান!

মাথা নেড়ে ডাক্তার বললেন—ধাপ্পা! সেরেফ ধাপ্পা! ওতে রোগ সারে না। এ ধাপ্পা চালানো, মানে, বুড়ো বাপকে বিশ্বাসের আশায় খানিকটা ইন্‌জেক্‌শন মাত্র! নইলে অন্নদাবাবুর মৃত্যু অনিবার্য। তবে, আমি দিনরাত ভাবছি, বই দেখছি—নানা রকমে দেখছি যদি কিছু রিলিফ দিতে পারি। একটা নতুন ট্রিটমেন্ট শুরু করেছি

সম্প্রতি, এ্যাণ্ড আই হ্যাভ সাম হোপ ইন দিস নিউ ট্রিটমেণ্ট! নিরাশ বা হতাশ আমি হইনি, হবো না কোনো দিন।

প্লাটফর্মে ভিড় জমছিল, ইঞ্জিন এসে গাড়ীতে লাগলো।

ডাক্তার বললেন—আর নয়, সরে পড়ো। আবার দেখা হবে। তোমায় ফিরতে হবে তোমার ডেরায়। গুড নাইট্ ইয়ং ম্যান—

—গুড নাইট!

প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে মোটরে উঠবো—দেখি মোটরের সামনে অন্নদাবাবু! অন্নদাবাবু বললেন—বাড়ীতে আমি স্থির হয়ে থাকতে পারলুম না, আর একখানা গাড়ী নিয়ে এলুম চলে' স্টেশনে। গাড়ীতে ওঠো, তোমাকে পৌঁছে দি—আর অমনি শুনি ডাক্তার মজুমদার কি বললেন!

দুজনে গাড়ীতে উঠে বসলুম, বললুম অন্নদাবাবুকে। ডাক্তার মজুমদারের অভিমত—নতুন ট্রিটমেণ্ট শুরু করেছেন এবং হতাশ নন—তিনি আশা করেন, এ ট্রিটমেণ্টে সুফল পাবো আমরা।

কথা শুনে অন্নদাবাবু চুপ করে' রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর মস্ত একটা নিশ্বাস—নিশ্বাস ফেলে আমার একখানা হাত নিজের হাতে চেপে ধরে অন্নদাবাবু বললেন গদগদ কণ্ঠে—মাই বয়, আই এ্যাম গ্রেটফুল—সিরিয়াসলি গ্রেটফুল টু ইউ—তোমার কোনো কিছু প্রয়োজন যদি থাকে আমাকে বলো—'কিন্তু' করো না। আমি তোমাকে নিজের ছেলের মতো দেখি, বিশ্বাস করো!

কথার পর আর একটা নিশ্বাস।···

গাড়ী এসে পৌঁছুলো আমাদের ব্যারাকের সামনে। নামলাম গাড়ী থেকে। আমার হাতখানা ধরে অন্নদাবাবু বললেন—কাল আসতে পারবে তো?

বললুম—পারবো।

—কখন অফ্ ডিউটি ?

একটু ভেবে জবাব দিলুম—বেলা চারটে

—বেশ, চারটের এই গাড়ী আসবে এখানে। এসো আমার ওখানে।

—আসবো।

গাড়ী গেল চলে, আমি ঢুকলুম ব্যারাকের ফটকে।

পরের দিন যথাসময়ে অন্নদাবাবুর বাড়ী। মনটা আশ্চর্যরকম হাল্‌কা মনে হচ্ছিল, চারিদিকে কেমন যেন খুশির ভাব! মনে হচ্ছিল, ঐ যে ঘরবাড়ী, পথে লোকজনের মেলা—আমি যেন ওদের সীমা কাটিয়ে কোন্ ঊর্ধ্বলোকের জীব।

বাড়ীতে পৌঁছবামাত্র অন্নদাবাবুর সঙ্গে দেখা। আবেগভরে তিনি আমায় বুকে চেপে ধরলেন, বললেন—এসো এনা মীরা আছে টাওয়ারে!

লিফটে চড়ে টাওয়ার। গ্রামোফোনে চলেছে একখানা বাঙলা গান—

লয়লা কি খেলা খেলে
এ যে নূতন খেলা...

এ গান জানা—মিস বেদানার গান। এখনকার দিনে ও রেকর্ড বাজে না। এখন বাজে অর্থহীন আধুনিক গান!

আমাকে অন্নদাবাবু পৌঁছে দিলেন ওঁদের কাছে, বললেন তোমরা গল্প করো, আমি আসছি একটু কাজ সেরে।

তিনি চলে গেলেন। গায়ের উপর র‍্যাগখানাকে ভালো করে' চাপা দিয়ে এনা বললেন মীরাকে—গ্রামোফোন বন্ধ কর মীরা।

গ্রামোফোন বন্ধ হলো। আমার পানে চেয়ে এনা বললেন, বেশ সস্মিত মুখে বললেন—বসুন (বসলুম) আপনার জন্যে কি ভাবে আজ অপেক্ষা করে আছি! হাঁ, এখন বলুন তো, প্রত্যেকটি কথা আমি শুনতে চাই—ডাক্তার মজুমদার কি বলেছেন আমার সম্বন্ধে! বাবার

মুখে শুনেছি—কিন্তু বাবা কি যে কত বললেন—কাল রাত তখন অনেক—ঘুম হচ্ছিল না, চুপ করে শুয়ে আছি, হঠাৎ বাবা এলেন ঘরে, চাপা গলায় বললেন—ঘুমিয়েছিস মা? বললুম—না। তখন বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললেন—ডাক্তার কথা দেছেন মা—আমায় নয়, গাঙ্গুলীকে। বলেছে তুমি সেরে উঠবে এ নতুন চিকিৎসায়। বাবার সে কী আহ্লাদ, কি যে পাগলের মতো বললেন তারপর কত কথা! এখন আপনি বলুন তো, কি বলেছেন ডাক্তার মজুমদার।

নদীতে স্নান করতে নেমেছি, হঠাৎ বড় ঢেউ এলে যেমন পা যায় সরে, আমার হলো ঠিক সেই দশা। কেমন লজ্জিত হলুম আমি। বুঝলুম অন্নদাবাবু কাল রাত্রে ফিরে এসে আমার মুখে-শোনা খবর বলেছেন! আমাকে হুঁশিয়ার করে' দিয়েছিলেন ডাক্তারের সঙ্গে আমার এসম্বন্ধে কথা কেউ না টের পায়। অথচ—

আমি নিরুত্তর। এনা বললেন—কেন, বলবেন না কেন? কি ভাবচেন? ডাক্তার বাজে বাত্তালা দেছেন, না? এনার দুটি চোখ হঠাৎ হলো করুণ—মলিন।—না-না—আমি বললুম, তিনি বলেছেন, আমি যা বুঝলুম, এ নতুন ব্যবস্থায় তিনি সুফল পাবেন বলেই আশা করেন। বললেন—হতাশা বা নৈরাশ্য তাঁর মোটে নেই।

মুখ মলিন, এনা বললেন—একথা আপনি কাল শুনেচেন—আমি শুনে আসচি আজ তিন বছর ধরে।

কথার পর মৃদু নিশ্বাস। আমার মনখানা উঠলো দুলে। আমি বললুম—কোনো ভালো ডাক্তার কোনো রোগের সম্বন্ধে নিশ্চিত করে' বলতে পারেন না যে কতদিনে সারবে—বিশেষ, অনেক দিনের যে রোগ। তবে তিনি বলেছেন, আশাই তিনি রাখেন, নিরাশা মোটে নয়।

এনা বললেন—ডাক্তার মজুমদারের মনের কথা কেউ আজ পর্যন্ত জানতে পারেনি। উনি কেবল বলেন—অধীর হয়ো না মা—ধৈর্য রাখতে হবে।—কিন্তু মানুষ কত ধৈর্য রাখতে পারে?

আমি বললুম—ডক্টর মজুমদারের সঙ্গে যেতে যেতে আমি ঐ কথাই তাঁকে বার বার জিজ্ঞাসা করেছিলুম—সারবার কোনো সম্ভাবনা আছে, সত্যি? না, আপনারা চিকিৎসার জন্যই চিকিৎসা করছেন। কথাটা ইমপার্টিনেন্ট খুবই, তবে মানুষটি সত্যই পণ্ডিত এবং চিকিৎসায় নিষ্ঠা আছে—শুনেছি আপনার বাবার কাছে, তাই ভরসা করে' ও প্রশ্ন করেছিলুম।

দু চোখে একটু যেন দীপ্তি—এনা তাকালেন আমার পানে, বললেন—কি জবাব দিলেন তাতে?

তাতে বললেন, নতুন একটা ট্রিটমেন্ট শুরু করেছেন—বিলেতের এক বড় স্পেশালিস্টের সঙ্গে আপনার অসুখ সম্বন্ধে বিশেষ পরামর্শ করে এবং এ ট্রিটমেন্টে উনি বেশ জোর আশা রাখেন আপনাকে সারিয়ে তুলতে পারবেন বলে, তবে সময় সাপেক্ষ।

নিশ্বাস ফেলে এনা বললেন—সময় সাপেক্ষ! ওঁর কাছ থেকে ঠিক কথা আদায় করবে, এমন মানুষ আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি! উনি যদি বলেন, ছমাস কেন ছবছর লাগবে সারতে, দশ বছর লাগবে সারতে, তাহলেও সে ছ বছর দশ বছর আমি মুখ টিপে ধৈর্য ধরে থাকতে পারি। কিন্তু তা তো নয়, শুধু সারবে—সারবে—সারবে—আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। থাক, ওকথা ছেড়ে দিন। আমি এ রোগ সারার কথা আর ভাবতে পারি না। অন্য কথা হোক। হ্যাঁ, জানেন, আজ সকালে বাবা আমায় মোটরে করে' অনেকখানি ঘুরিয়ে এনেছেন! এখান থেকে পেরিয়ে ঐ গুমতির পুল পার হয়ে

হজরতগঞ্জের রাস্তা ধরে রেলের লাইন পেরিয়ে আপনাদের ক্যাণ্টনমেণ্ট পর্যন্ত, তারপর সেখান থেকে ফেরবার মুখে ··· ঐ এ্যালাহাবাদ ব্যাঙ্ক আছে না? তার পাশ দিয়ে গেছে আউটরাম রোড। সেই রোড ধরে সেই বাদশা নগর রেলোয়ে স্টেশন—এত চমৎকার লাগছিল! রাস্তার লোকজন আমাদের পানে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। বাবার গাড়ী তো চেনে। ভাবছিল,—চক্করবর্তি-সাহেবের খোঁড়া মেয়ের শখ ত্যাখো! মোটরে বেড়াতে বেরিয়েছেন! আগে এ কথা ভাবতে আমি শিউরে উঠতুম। ঐজন্য বেড়াতে বেরুতাম না। এই বাড়ীর মধ্যে বন্দী হয়ে আছি, আজ দু-তিন বছর মোটে বাড়ীর বার হইনি! আজ বেড়িয়ে এসে বাবাকে বলেছি, রোজ আমি বেড়াতে বেরুবো, বাড়ীর বাইরে পৃথিবী আছে—সে কথা ভুলে থাকতে চাই না! বাবা বলেছেন, বেশ তো! তার উপর বাবা কি বলেছেন, জানেন?

সপ্রশ্ন দৃষ্টি আমার মুখে নিবদ্ধ করে' এনার এ প্রশ্ন।

আমাকে সাড়া দিতে হলো। বললুম—কি?

এনা বললেন—বাবা বলেচেন, কাল রবিবার, কাল সব পিকনিকে যাই, চ'মা! কোথায় পিকনিক, জানেন? লক্ষ্ণৌ থেকে একুশ মাইল দূরে সেলিমপুর, সেই সেলিমপুরের পথে বাদশাবাগ বলে' মস্ত বাগান আছে, বাড়ী আছে, নবাব আশফদ্দৌলার বাগান-বাড়ী ছিল, এখন জরাজীর্ণ হলেও যা আছে, দেখবার মতো! জানেন, বাবার কাছে মীরা আর আমি কি বলেছি?

আমি বললুম—কি?

চমৎকার আবদারের সুরে এনা বললেন—আপনি বলুন, আমি বলবো কেন?

এনার সারল্যে আমি মুগ্ধ হলুম! হেসে আমি জবাব দিলুম—আমি

তো অন্তর্যামী ভগবান নই যে, আপনাদের অন্তরের মধ্যে ঢুকে অন্তরের কথা জেনে বলে দেবো!

দু'চোখে সলাজ সহাস দৃষ্টি, এনা বললেন—পারলেন না তো! হুঁ-হুঁ, এত বড় মিলিটারী অফিসার—এই আপনার সামর্থ্য! শুনুন, আমরা বলেছি, আপনাকে নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে—পিকনিকে ...

লোভ জাগলো দুনিবার, কিন্তু কি করে' তা হয়? আমি বললুম—আমি তো স্বাধীন নই যে মনের স্বাধীন ইচ্ছামতো কাজ করবো! আমি পরের চাকরি করি—সার্ভেণ্ট—আমাকে মনিব ছাড়বে কেন?

মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে এনা বললেন,—বাবা সে ব্যবস্থা করবেন। বলেছেন, আপনাদের রেজিমেণ্টের কমাণ্ডিং অফিসারদের সঙ্গে বাবার খুব ভাব, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এ বাড়ীতে এসেছেন। ছুটি বাবা করিয়ে নেবেন।

অন্নদাবাবুর যে কথা, সে কাজ! আমার ছুটি তিনি মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন। বেলা আটটায় প্রকাণ্ড মোটর আমার ব্যারাকের ফটকে এসে দাঁড়ালো, আমি এলুম বেরিয়ে। এসে দেখি একখানা নয়, দুখানা মোটর। একটায় অন্নদাবাবু এনা আর মীরা দেবী, আর একখানায় খানশামা বাবুর্চি খিদমদগারের দল। আমাকে উঠতে হলো অন্নদাবাবুর গাড়ীতে। গাড়ি চললো।

হাসিগল্প, আনন্দের উচ্ছ্বাসে পথ হলো মুখর। চমৎকার ট্রিপ! শহর ছাড়িয়ে পল্লীর পথে আসতে যেন থিয়েটারের দৃশ্যপট গেল বদলে, পাতার কুঁড়ে, মাটী-লেপা দেওয়ালে নানা উদ্ভট নক্সা আঁকা। কুঁড়েগুলোর পর বন, প্রান্তর, মাঠ—পথের ধারে ময়ূরের কি ভিড়! নির্ভয়ে বিচরণ করছে। আমাদের পানে দৃষ্টিপাত করে না। বুনো

খরগোশ, তারপর হরিণ—জঙ্গলের মধ্যে এমন সহজ নির্ভয় চিত্তে এর আগে হরিণকে কখনো দেখিনি! বললুম—যারা শিকারী, এ পথে চলতে পায়ে পায়ে তারা হরিণ শিকার করতে পারে!

অন্নদাবাবু বললেন—কিন্তু এদের মারা বারণ, কেউ যদি মারে তাহলে তাকে প্রশিকিউট্ করা হবে।

এনা দেবী বললেন—আপনার হাত নিশপিশ করছে না কি?

বললুম—করছে বই কি!

এনা দেবী বললেন—ছি ছি, এ কথা বলবেন না লেফটেনাণ্ট সাহেব, নিরীহ হরিণ, এরা আপনার কোন অনিষ্ট করেনি। কি সরল বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে। জানে না, বোঝে না যে, আমরা মানুষগুলো ওদের মারবার জন্য ওৎ পেতে থাকি!

হেসে মীরা বললেন—আপনার শিকার হলো মানুষ। তারা অস্ত্র বাগাতে জানে। এরা তা জানে না, এদের মারলে কেউ আপনাকে বীরেন্দ্র সিংহ বলবে না।

অপ্রতিভ ভাবে আমি বললুম—না, না, আমাকে এতখানি হিংস্র ভাবছেন কেন? রাইফেল নিয়ে রোজ কুচকাওয়াজ করি ঠিকই, রাইফেল চালাবার কসরতও শিখেছি বহু, কিন্তু ঐ পর্যন্ত! গুলি চালিয়েছি মাটীর ঢিপিকে, নয় টার্গেট-পোস্টে, কোনো সজীব প্রাণীকে ঘায়েল করবার জন্য আজো শস্ত্র প্রয়োগ করিনি, আমার চেয়ে খোট্টা নাপিতগুলো অস্ত্রের গর্ব করতে পারে—নখ কাটতে অনেকবার আঙ্গুলে রক্ত বার করেছে, দাড়ি চাঁছতে, মাথা চাঁছতে অনেকের রক্ত বার করে' দেছে, আমি মারবার মধ্যে মেরেছি মশা, তাও অস্ত্রাঘাতে নয়—চপেটাঘাতে। জীবিকার প্রয়োজনে আমি মিলিটারী, হিংসাবশে মিলিটারী নই।

আমার কথায় উঠলো প্রবল হাস্যের উচ্ছ্বাস।

বেলা দশটায় একটা গ্রামে ঢুকে আমাদের মোটর থামলো—প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠ। অন্নদাবাবুর কথায় মোটর থামলো। তিনি নামলেন গাড়ী থেকে, খানশামা বেয়ারাদের আদেশ দিলেন, মাঠে বড় জাজিম বিছিয়ে দেবার জন্য। জাজিম পড়লো মাঠে—ভোজন-পাত্রাদি নামলো—প্লেট ডিশ স্টোভ কাঁটা-চামচ—আয়োজনের প্রচণ্ড সমারোহ।

গাড়ীর কাছেই তিনখানা ক্যাম্প চেয়ার খাটানো হলো। একটা বড় ক্যাম্প টেবিল, এনা বসলেন গাড়ীতে, অন্নদাবাবু মীরা এবং আমি আমরা বসলুম ক্যাম্প চেয়ারে। তারপর সকলের পান-ভোজনপর্ব।

সে পর্ব সারা হলে একটু বিশ্রাম। তারপর বেলা সাড়ে এগারটায় পুনর্যাত্রা! কিন্তু সে পিকনিকের বিশদ বর্ণনার কোনো প্রয়োজন দেখি না। এ অভিযানের কথাটুকু বললুম, শুধু পরের ঘটনাগুলোর গতি বোঝবার সুবিধা হবে বলে'।

ফিরলুম সন্ধ্যার সময়। বাদশাবাগে এনাকে নামানো হয়েছিল। পথে বড় বড় কতকগুলো গাছ, সেই গাছগুলোর তলায় অনেকখানি জায়গা সাফ করিয়ে চাঁদোয়া খাটানো হলো। মীরা আর আমি দুজনে পাঁজাকোলা করে এনাকে নামিয়ে হাইব্যাক চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিলুম। খাওয়া-দাওয়া, গান-গল্প—হাসি-তামাসা—দিনটা কেটেছিল অত্যন্ত সুমধুর আনন্দে!··· সন্ধ্যার আগে এনাকে আমরাই সযত্নে গাড়ীতে এনে তুললুম—গ্রামের কত লোক এসে জমেছিল আমাদের দেখতে। সকলকেই অন্নদাবাবু ভোজনে অর্থদানে খুশি করেছিলেন। গাড়ী যখন ছাড়লো, মনে হলো, জীবন-গ্রন্থের একটা উজ্জ্বল পৃষ্ঠা মুড়ে বন্ধ করলুম যেন!

১১

দুদিন পরের কথা। বেলা প্রায় বারোটা, আহারাদি শেষ করে' ব্যারাকে নিজের খাটে দেহ এলিয়ে একখানা ইংরেজী নভেল পড়বার চেষ্টা করছি। চেষ্টাই—কারণ, একটা ছত্র পড়া হচ্ছিল না—মনকে বইয়ের পাতায় কিছুতেই চেপে বসাতে পারছিলুম না। মন জুড়ে শুধু এনা—এনা—এনা! বেচারী! এমন জীবন্ত মন, ঐ রুগ্ন দেহের মধ্যে নির্জীব হয়ে রয়েছে! কোনো উপায় নেই?—এত মিরাক্‌লের কথা শুনি, আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসীদের কৃপায় দুরারোগ্য কতব্যাধি-সারার গল্প শুনে আসছি চিরকাল—তারকেশ্বরে হত্যা দেওয়া মন্দিরে মানত, তার কোনোটায় এনাকে সুস্থ সজীব করে' তোলা যায় না?

বেয়ারা এসে একখানা টেলিগ্রাম দিলে! চমকে উঠলুম—আমার টেলিগ্রাম! বুকখানা ছাঁৎ করে' উঠলো! বাড়ীতে কারো অসুখ হলো না তো? শক্ত অসুখ? বাড়ী ছাড়া আর কোথা থেকে আমাকে কে বা পাঠাবে টেলিগ্রাম।

রসিদ সই করে' কম্পিত হাতে লেফাফা ছিঁড়ে টেলিগ্রাম বার করলুম!··· কে করলে, আগেই দেখলুম সেণ্ডারের নাম! দেখি, মজুমদার! চকিত-চমক! মজুমদার কে?—তখনি মীমাংসা হয়ে গেল—ডক্টর মজুমদারের টেলিগ্রাম। তারে তিনি সংবাদ জানিয়েছেন, সেই দিনই বিকেলে চারটের সময় তিনি পৌঁছুচ্ছেন লক্ষ্ণৌ—ট্রেনে—আমাকে জানিয়েছেন, আমি যেন সে সময় স্টেশনে কেলনারের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করি জরুরি প্রয়োজন।

চমকে উঠলুম। আসছেন তিনি অন্নদাবাবুর ওখানে, বুঝলুম, কিন্তু সে আসায় আমাকে এমন জরুরি প্রয়োজন কেন ?...

রবিবারের পিকনিকের পর সোমবার অন্নদাবাবুর ওখানে যাইনি। মঙ্গলবারে যাবো বলে বেরিয়েছিলুম কিন্তু যাওয়া ঘটেনি—দুজন বন্ধু সবলে আমাকে ধরে সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিল! আজ ওখানে যাবার জন্য মনে অসহ্যরকম বাসনা।

তবু চারটের সময় গেলাম। ট্রেন এলো। ডক্টর মজুমদার নামলেন ট্রেন থেকে।

কেলনারে দুজনে বসা গেল। মজুমদার বললেন—সে রাত্রে আমাদের যে-সব কথা হয়েছিল তাই থেকে তুমি এমন কি আশার বাণী শুনিয়েছো এনাকে ? এনা নিজে আমাকে চিঠি লিখেছে—অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। আর আমাকে আজ আসবার জন্য মিনতি করে'—তার সঙ্গে অন্নদাবাবুর টেলিগ্রাম—আমি যেন আজ নিশ্চয় আসি। তাই তোমাকে টেলিগ্রাম করেছি, মানে ওখানে যাবার আগে তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই—কি রিপোর্ট তুমি দেছো ওখানে—সে রাত্রের কথার সম্বন্ধে।

আমার বুকখানা ধড়াশ করে উঠলো। কোনোমতে আমি বললুম—আমি এমন কিছু বলিনি তো। যেটুকু বলেছি, মানে অন্নদাবাবু আলাদা গাড়ী করে এসে স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য, তাঁকে যে রকম অস্থির উথলা দেখেছিলুম, মানে, তিনি ব্যথা না পান, সেজন্য, মানে, শুধু করুণাবশে, শুধু অনুকম্পা ...

আমার কথায় বাধা দিয়ে মজুমদার বললেন—অনুকম্পা! করুণা! হুঁ কিন্তু জানো, আমাদের এই করুণা আর অনুকম্পা—এতে অপরের কতখানি অনিষ্ট আমরা করি! করুণা আর অনুকম্পাকে

দাবিয়ে চলতে হয় এ দুনিয়ায়! জানো, It does far more harm than any amount of indifference. আমরা ডাক্তার—আজ ম্যাজিস্ট্রেটদের মতো করুণায় বা অনুকম্পায় বিগলিত হলে আমাদের চলে না! খুনী, চোর তাদের নানা দুঃখের কাহিনী শুনে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের করুণা যেমন চলতে পারে না—আমাদের পক্ষেও করুণা-অনুকম্পা তেমনি মারাত্মক ব্যাপার!

আমি বললুম—কিন্তু রোগীর বেলায়—ভাবুন, মিথ্যা করে'ও যদি একটু আশা দেন, তাতে তার দুশ্চিন্তা কতখানি ···

—ধরেছি নিশ্চয়! কিন্তু জেনে রেখো, ভাবাবেগ অর্থাৎ emotions, মেয়েদের মনে আশ্চর্য তার ক্রিয়া! সে emotions বাস্তব ক্ষেত্রে—বিশেষ করে' রোগীর রোগ সারাবার পক্ষে কি সাহায্য করবে! আমি একটা নতুন treatment চেষ্টা করছি, তার ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত নই, চেষ্টা চলেছে মাত্র! হয়তো সুফল পাবো—কিন্তু তার আশা কতটুকুন্!··· কাজেই এর উপর নির্ভর করে রোগীকে ভরসা দেওয়া অন্যায় ডাক্তারের পক্ষে—there should be no illusions—বেচারী এনা—সে সেরে উঠুক—আমরা সকলেই তাই চাই, we both mean equally will ··· এখন চলো যাওয়া যাক ···

ডক্টর মজুমদার রোগী দেখলেন। এনা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে—আপনি কেবলি বলেন, আমি সারবো, কিন্তু কতদিনে—কত মাসে—কত বছরে—আজ আমাকে বলতেই হবে! ···

ডক্টর মজুমদার বললেন—সে কথা আমি জানি না—কাজেই মিথ্যা করে' তোমাকে যা-তা বলতে পারি না তো! যেটুকু বলেছি, তার উপরেই তোমাকে নির্ভর করে থাকতে হবে, এনা-মা—

কথাটা ভারী কঠিন রুক্ষ লাগলো আমার—এ কথায় এনার মুখও হলো মলিন। সে উদাস নয়নে তাকালো খোলা খড়খড়ি দিয়ে বাইরের পানে। ডক্টর মজুমদার বললেন—মা, অমনি বিমুখ হলেন! না এনা, এরকম মনে অভিমান করলে চলবে কেন! কি এসে দেখলুম—কি হাসিমুখ, কি খুশিমন—আর চকিতে হাসিখুশি সব গেল মিলিয়ে! ছেলেবেলায় একটা বাংলা গান শুনতুম—এখন আর শুনি না—গানটা হলো,—

হাসিভরা মুখে ফুটন্ত নলিনী
এসেছিল হেলেদুলে
মনমরা মুখে ম্লান নলিনী
ফিরে গেল আঁখিজলে—

না-না-না—হাসিখুশি চাই, বুঝলে এনা-মা—আমার দাওয়াই, আমার যন্ত্রতন্ত্র—এ সবের সঙ্গে তোমার মুখের হাসি আর মনের খুশি মিশিয়ে দিতে হবে অজস্রভাবে ··· যদি চটপট সারতে চাও। বুঝলে?

মজুমদার গেলেন চলে সন্ধ্যা সাতটার আগেই। লক্ষ্ণৌ শহরেই আর একটা জরুরি ডাক ছিল। আমার চলে আসা হলো না। এনা বললেন—আপনিও যাবেন না তা বলে ···

স্বর বেশ কঠিন—স্বরে আদেশের ভঙ্গী!

নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলুম। এনা বললেন—বসুন, না, ডিউটি আছে?

বসতে হলো, বসলুম।

ঘরে এনা আর আমি—দুজনে মাত্র! কারো মুখে কথা নেই, দুজনেই চুপ—

হঠাৎ এনা বললেন—যান—আপনার অসহ্য লাগছে, মিথ্যা রোগীর ঘরে জড়ভরত হয়ে বসে থেকে পাথর বনতে হবে না!—

বুঝলুম মনের কোথায় ঘা লেগেছে, রুদ্র অভিমান!

কণ্ঠে দরদ মিশিয়ে অত্যন্ত স্নেহভরা কণ্ঠে আমি ডাকলুম—এনা দেবী!

আগুনে যেন ঘীয়ের ফোঁটা পড়লো। শ্লেষ ব্যাঙ্গের স্বরে এনা বলে উঠলেন—এনা দেবী! থাক আমার উপর স্নেহবাৎসল্য প্রকাশ করতে হবে না। কে চায় আপনার স্নেহ দরদ বাৎসল্য? আমার চেয়ে বয়সে ক'বছরের বড় আপনি যে বাৎসল্য আর দরদ দেখাতে আসেন? আমাকে নিয়ে সকলের থাসা তামাশা চলেছে, আমি একটা সঙ্, না, চিড়িয়াখানার জানোয়ার!

কথাগুলোর মর্ম বুঝলুম না!··· নির্বাক বিস্ময়ে এনার পানে চেয়ে রইলুম।

এনা বললেন—জানেন, ডাক্তার আজ কি বলে গেছেন? বলে গেছেন হাওয়া বদল করতে—বলেচেন, নৈনিতাল যেতে। সেখানে বাবার বাড়ী আছে সেইখানে।

ঠিক নৈনিতালের কথা শুনিনি—তবে ঠাঁইবদলের কথা বলেছিলেন বটে ডক্টর মজুমদার। মামুলি পরিচিত আবহাওয়া থেকে অন্যত্র যাওয়া—মনের উপর, চোখের উপর তার প্রভাব অনেকখানি। বুঝলুম—ভালো কথা তো। এখানে নিত্য সেই এক আকাশ এক বাতাস আর চারিদিকে ঐ একই রকমের গাছপালা—পথঘাট ···

এনা ফোঁশ করে উঠলেন, বললেন—আপনিও বেঁচে যাবেন। এখানে আর রুটিন মেনে এসে জ্বালাতন হতে হবে না, রোগীর কাছে বসে রোগীর প্যানপ্যানানি ···

আমার বিস্ময় বাড়লো, আমি বললুম—কি বলতে চান আপনি?

—আপনি পারেন যেতে নৈনিতাল—এমনি অপরের কথায়?

বললুম—উপায় থাকলে চলে যেতুম! হতভাগা পরের চাকর আমি—যাবার কোনো উপায় নেই।

—থামুন থামুন! এনা বললেন—সব কথায় আপনার মুরুব্বির ভঙ্গী। মনে করলে যেতে পারেন খুব। বরং বলুন, না, যাবেন না—সেখানে গেলে এই রোগীর প্যানপ্যানানি শুনতে হবে কিনা! পরের চাকরি! চাকরিতে ছুটি মেলে না—এই কথা আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে বলেন!

আমি বললুম—চাকরিতে ছুটি মেলে সব ডিপার্টমেণ্টেই, কিন্তু আমাদের হলো মিলিটারী সার্ভিস—এক ঘণ্টা বাইরে যেতে হলে তার জন্যও ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিতে হয়! নৈনিতালে যেতে হলে একঘণ্টার ছুটি নিলে যদি চলতো, নিশ্চয় যেতুম!

—যান যান! আপনি যদি মনে করেন, নিশ্চয় ছুটি পান! থাক, যেতে হবে না আপনাকে। আপনি ভাবেন, আপনাকে না পেলে নৈনিতালে আমাদের দিন কাটবে না, না, নৈনিতালে যাওয়া হবে না?

বললুম—আমি সেকথা বলিনি তো।

এনা বললেন—বাবা যদি আপনার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দ্যান—বলেছি তো আপনার বড় বড় অফিসারদের কাছে বাবার খুব খাতির আছে ···

এ কথায় আমার মন তিক্ত হলো। চাকরি যত নগণ্য হোক, সে চাকরিতে মাহিনা যত তুচ্ছ হোক, তা বলে একজন মুরুব্বি ধরে অফিসারদের প্রসাদ লাভ—কিন্তু এনা বালিকা, তার উপর রোগী। কাজেই সেকথা তুলে নিজের মর্যাদাবোধের পরিচয় দিতে পারলুম না। সহজ কণ্ঠে বললুম—হুঁ, ছুটি যেন মিললো! তারপর নৈনিতাল যাওয়ার খরচ! সরকার ছুটি দিলেও হাওয়া খাবার খরচ তো দেবে না।

—ও—তাই? এনা বললেন—কতই বা খরচ! আর সে খরচ আপনার লাগবে কেন? আপনাকে আমরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাচ্ছি, আপনি আমাদের গেস্ট হয়ে যাবেন, গেস্টের কাছ থেকে বুঝি কেউ খরচ নেয়?

সসঙ্কোচে আমি বললুম—কিন্তু আমার উচিত হবে এমন করে' আমার দায় আপনার বাবার ঘাড়ে চাপানো? আমি শক্ত সমর্থ পুরুষ মানুষ, বিধবা মেয়েমানুষ নই! না, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না—যাবার যত ইচ্ছাই থাকুক! জানেন, কত টাকা মাসে মাইনে পাই? আপনাদের বাড়ীর খানশামারা যা পায়—সেই রেটে! সে টাকার মধ্যে আছে মেসের খরচ, দরজী, নাপিত, বেয়ারা—আর এই চাকরির মর্যাদা বজায় রাখতে যা যা ব্যবহার দরকার। সেই ব্যবস্থা পালন করতে।—এ ছাড়া বাড়ীতে মাসে মাসে খরচ পাঠাতে হয়, গরীবের সংসার, সেই টাকাতেই কোনমতে চালাতে হয়! হাওয়া খাবার লাক্সারি আমার সাজে না!

কথাটা বলবো বলে' বলিনি, কথার পিঠে কথাগুলো আপনা থেকেই মন থেকে এলো বেরিয়ে। বুঝিনি, একথাগুলোর তীব্র বিষ থাকতে পারে। দীর্ঘকাল রোগ-শয্যায় শায়িতা অসহায় আর্ত কিশোরীর মনে ওকথার বিষ তীব্র হয়ে বিঁধবে। কথা শেষ করে' আমি চাইলুম অসহায় দৃষ্টিতে এনার পানে, লক্ষ্য করলুম এনার তীব্র কঠিন দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ, মুখখানা হলো গোলাপের মতো রাঙা। এনা বললেন—এত দৈন্য যদি, কি বলে অত দামী দামী ফুল কিনে আমাকে উপহার দেন? এ নবাবীর কোনো কারণ নেই তো।

আমার মুখের উপর যেন চাবুক পড়লো! এনা খাড়া হয়ে

বসলেন। মাথা তুলে বলতে লাগলেন—আপনি ভাবেন, আপনার এসব আবোল-তাবোল আমি বিশ্বাস করবো! রোগে বিছানায় পড়ে থাকলেও এতখানি বোকা আমি নই। তা ছাড়া আপনি যখন গেস্ট হয়ে যাবেন, অনার্ড গেস্ট ···

বাধা দিয়ে আমি বললুম—ক্ষমা করুন, ওকথা থাক। আসল কথা হলো, আমার জন্য কেউ সই-সুপারিশ করবেন—এ আমি চাই না। যাদের সঙ্গে আমি থাকি, কাজ করি—অপরের পয়সায় তাদের তাক লাগিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবো, ছুটি এন্‌জয়্ করবো—এমন স্পর্ধা যেন আমার কখনো না হয়। আমি জানি, আপনার বাবা আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করেন। আপনারা আমাকে হেয়জ্ঞান করেন না—বন্ধু রূপে দেখেন—সে আমার গৌরব, সে গৌরবের অমার্যাদা করতে আমার বাধে। আপনি ও কথা ছেড়ে দিন মিস্ চাকারবার্টি ···

—ও, আপনি তাহলে আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না—যেতে আপনি চান না?

—যেতে চাই না, এমন কথা বলচি না, বলিনি তো, আমি শুধু বুঝিয়ে বললুম, কেন আমি যেতে পারবো না।

এনার চোখের দৃষ্টি নিথর, পলকহীন। এনা বললেন—যদি আমার বাবা আপনাকে অনুরোধ করেন?

মাথা নামিয়ে আমি বললুম—তবু না।

—তবু নয়! হুঁ—আচ্ছা, আমি যদি হাত জোড় করে মিনতি জানাই—বন্ধুকে মানুষ যেমন মিনতি জানায়?

—না, দয়া করে' তেমন মিনতি জানাবেন না আপনি। আমি নিরুপায় জানবেন।

এনার মুখে কথা নেই, চোখে পলকহীন দৃষ্টি—আমার মুখে

নিবদ্ধ! আমিও পলকহীন নেত্রে তাঁর পানে চেয়ে। এনার ঠোঁট দুটি কাঁপলো—ঈষৎ! দুচোখে ফুটলো ভ্রুকুটি ভঙ্গী, একটা নিশ্বাস ফেলে দাঁতে দাঁতে চেপে এনা বললেন—বেশ, আমাদের বন্ধুত্বও তাহলে এইখানে শেষ! আমি দেখছিলুম, আমাদের উপর কতখানি আপনার স্নেহ-মমতা। আপনার ব্যারাকের কে বন্ধু আপনাকে শ্লেষ করবে, সেই ভয়ে আপনি আমাদের আনন্দ দিতে পারবেন না। বেশ, আপনাকে আর অনুরোধ করবো না। আপনি যেতে চান না, যাবেন না। ভালো করেই বুঝলুম আজ আপনার মন। ···

কথাগুলো শেষ করে' শ্রান্ত অবসন্ন ভাবে এনা বালিশে মাথা হেলিয়ে দিলেন—চকিতের জন্য, তখনি মাথা তুলে বসলেন আবার, বড় চেয়ারের হাতলদুটো ধরে সামনের দিকে ঝুঁকলেন, ঝুঁকে বললেন—আমাদের অনুরোধ মিথ্যা তাহলে! যাক, আপনার মর্জি হয়েছিল, তাই এখানে এতদিন আসা-যাওয়া করেছেন, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, সত্য জবাব দেবেন?

—বলুন, মিথ্যা আমি বলি না।

—ঠিক বলবেন! Your word of honour.

My word of honour!

—হুঁ!

এনার চোখে আবার সেই মর্মভেদী দৃষ্টি! এনা বললেন—ভয় নেই, অনুরোধ করবো না, তবে একটা কথা শুধু জানতে চাই! আপনার মর্জি হয় এখানে আসবেন, মর্জি না হয় আসবেন না। আপনার আসায় না-আসায় আমার কিছু এসে যাবে না! তবে বলবেন আমায় দয়া করে'—এখানে আপনি কেন আসেন? কি এখানে পান? পেতে চান?

এ প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মনের মধ্যে কেমন যেন ওলোটপালোট হয়ে গেল। বিশৃঙ্খলা। কোনমতে আমি বললুম—এর উত্তর,—কিন্তু এর জন্য word of honour-এর কোনো প্রয়োজন ছিল না তো! উত্তর খুব simple.

—শুনতে চাইনা সে simple উত্তর ·

—নিশ্চয়! এর উত্তরে বলবো, আমার যেটুকু পরিচয় পেয়েছেন, তা থেকে হয়তো বুঝবেন, গরীব হলেও আমি গূঢ় চক্রান্তের মানুষ নই! এখানে আমার আসার জন্যে কোনো অভিসন্ধিও আমার নেই। এখানে এসে আমি আরাম পাই! স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা—বাড়ী ছেড়ে আসা অবধি যে প্রীতি ভালোবাসার অভাব বোধ করছিলুম, এখানে তা আমি পেয়েছি পর্যাপ্ত ভাবে। আমাদের জীবন কতখানি বৈচিত্র্যহীন বা মমতার কতখানি অভাব আমরা বোধ করি' আপনারা তা বুঝবেন না! এখানে আসি বাড়ীতে যে স্নেহপ্রীতি পেয়ে এসেছি এখানে ঠিক সেই রকম তা পাই, তাই আসি। চাকরির আবর্জনা থেকে মনটাকে মুক্ত করতে, স্বাচ্ছন্দ্য পেতে।

একাগ্রমনে এনা শুনলেন আমার কথা, উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে প্রশ্ন করলেন—আর আমার কাছে আসা? আমার কাছে বসা?

আমি বললুম—আমি একজন তুচ্ছ নগণ্য কর্মচারী আমাদের আমিতে, এখানে আপনারা আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন না, সমান আসনে বসিয়ে নিজেদের সঙ্গে সমান করে আমাকে দেখেন। আপনিও সেই চোখে আমায় দেখেন। জানেন না, আপনার সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন নানা গল্প করে কাটিয়ে দিই, গান গাই, আমার মনে হয়েছে, হয়তো আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কিন্তু আপনারা সকলে বড় ভালো, বড় ভদ্র—তাই আমাকে সহ্য করচেন, হয়তো তাতে আমি

প্রশ্রয় পেয়েছি অনেকখানি আর সেই প্রশ্রয়ে আমার এখানে আসা এতখানি নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে! বুঝলেন?

—ও, তাই! এনা নিশ্বাস ফেললেন—বুঝেছি, আপনি সত্য কথা বলচেন।—আশ্চর্য আপনার বিনয়! অর্থাৎ আমি চিররুগ্ন, অসহায়, তাই করুণা করে' আপনি আসেন গানে গল্পে যদি আমাকে খানিকটা খুশি রাখতে পারেন! কিন্তু জানেন, মানুষের এই করুণা—আমাকে বেঁধে কাঁটার মতো! আপনাদের এ করুণা আমার অত্যন্ত বিশ্রী লাগে, অসহ্য লাগে। এই করুণায় আমার অরুচি ধরে গেছে। আপনারা করুণা যদি করতে চান, তাহলে এই করুণা করুন, দয়া করে' করুণা করবেন না আমাকে। আপনাদের করুণা আমাকে ··· ও ··· না, না ··· করুণা নয় ··· অনুকম্পা নয় ··· আপানারা অকরুণ হলে, চিররুগ্ন বলে আমাকে ঘৃণা করলে আমি শান্তি পাবো, স্বস্তি পাবো ··· সত্যি আমি পরম সুখে সুখী হবো। আপনাদের এ করুণা আমার এত অসহ্য বোধ হয় যে, করুণার বশে সময় সময় আমার মনে হয়, ছাদের ঐ আলসেটার উপর ঝোঁক দিয়ে নীচে ঝাঁপ খেয়ে পড়ি, নিজেকে চুর করে' দি, শেষ করে' দি—হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ ···

বলতে বলতে দাউ, দাউ করে এনা যেন জ্বলে উঠলেন, একটা দারুণ চাঞ্চল্য, চেয়ার ছেড়ে উঠবার কি চেষ্টা, ক্র্যাচ দুটো ছিল পাশে পড়ে। চকিতে সে দুটো তুলে তাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, যেন চললেন, কিন্তু পারলেন না—পড়ে যাবেন বুঝি ···

আমি দু-হাতে তাঁকে ধরলুম। তাঁর প্রবল সংগ্রাম—নিজেকে মুক্ত করবার, দু হাতে আমাকে চড় মেরে, খিমচিকেটে চীৎকার ··· ছাড়ুন, ছাড়ুন, আমাকে ছেড়ে দিন—বলচি ··· খবরদার—না, না, আমি ঝাঁপ দেবো ঐ আলসেয় ঝুঁকে ···

সবলে আমার কবল থেকে মুক্তির প্রয়াস, আমাকে বেশ বেগ পেতে হলো, দুহাত ছুঁড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁর চীৎকার—যাও, যাও তুমি, আমাদের বাড়ী থেকে চলে যাও, চলে যাও!

তাঁকে সামলে রাখা দায়। আমার ভয় হলো, এতখানি উত্তেজনা, রোগা শরীর—

হঠাৎ মীরা এলেন ছুটে. তাঁর সঙ্গে লোকজন। এনার ভীষণ মূর্তি। ফুঁপিয়ে কান্না—

সকলে ধরাধরি করে' চেয়ারে বসালুম, জল এলো। এনা নেতিয়ে পড়লেন চেয়ারে হেলান দিয়ে।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে চাকা-চেয়ারে বসিয়ে এনাকে ওরা নামিয়ে নিয়ে গেল।

আমি রইলুম সেইখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে।

কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে ছিলুম, খেয়াল ছিল না। আধ ঘণ্টাটাক পর আমার সংবিৎ ফিরলো।

বেয়ারা ডাকলো—হুজুর!

ফিরে তাকালুম! বেয়ারা বললে—নীচে আপনাকে সেলাম

এলুম নীচে। আসতেই দেখি, সামনে মীরা।

মীরা বললেন—কিছু মনে করবেন না, লেফটেনাণ্ট গাঙ্গুলী।

আমি বললুম—না, না, এতে মনে করার কিছু নেই! কিছু মনে করিনি আমি। রোগে ভুগে ভুগে—

মীরা বললেন—আপনি চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। উনি কেমন আছেন?

—সামলেছে! তবে একবার ওর সঙ্গে দেখা করে গেলে ভালো হয়! আসবেন?

দ্বিধা ভরে প্রশ্ন করলুম—আসবো? কিন্তু যে-রকম exited হয়ে ছিলেন! আমাকে দেখলে যদি আবার—

শান্ত কণ্ঠে মীরা বললেন—না, ঠাণ্ডা হয়েছে! এনাই আপনার কথা বলছিল, ভারী লজ্জা পেয়েছে। আসুন, দেরি হবে না।

মীরার সঙ্গে এলুম এনার ঘরে। আমাকে ঘরে পৌছে দিয়েই মীরা গেলেন চলে।

আমি তাকালুম এনার পানে। খাটের বিছানায় শুয়ে আছেন এনা। আমাকে ডাকলেন—আসুন।

মৃদু নম্র কণ্ঠ!

আমি কাছে গেলুম—খাটের কাছে। এনা বললেন—বসুন ঐ কৌচটা টেনে—বিছানার কাছে ···

কৌচখানা টেনে তাঁর বিছানার কাছে বসলুম।

এনা বললেন—আমাকে ক্ষমা করবেন। অনেকক্ষণ রোদে ছিলুম বলে কেমন মাথার ঠিক ছিল না, আপনার উপর ভয়ানক জুলুম করেছি। বলুন, মনে রাখবেন না, ক্ষমা করেছেন, রাগ করেননি?

কণ্ঠে কি মিনতি! বললুম—কি আপনি বলচেন! রাগ করবো কেন?

—না, না, আমারই দোষ হয়েছিল।

—রাগ করেননি তা হলে?

—না!

—আবার আসবেন আমাদের এখানে—যেমন আসেন?

—আসবো, কিন্তু একটি শর্ত করতে হবে।

মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলে এনা বললেন—কি শর্ত বলুন—

—শর্ত হলো, আমি বললুম—আমাকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করবেন,

একটুকু সংশয় নয়, অবিশ্বাস নয়। আপনার মনে যখনি যে-কথা জাগবে, আমাকে বলবেন বন্ধুর মতো সরল বিশ্বাসে। আপনার কথায় আমি দোষ ধরবো বা বিরক্ত হবো এমন কথা কখনো মনে করবেন না! বলুন, এ শর্তে রাজী?

আমার পানে চেয়ে চোখের দৃষ্টিতে এনা জানালেন—হাঁ।

আমি বললুম—সেদিন পিকনিকে বেরিয়ে আপনাকে কতখানি সুস্থ দেখেছি, কী ভালোই না দেখাচ্ছিল আপনাকে। আপনার সে-দৃষ্টি আমি ভুলবো না। জানেন, রাত্রে সেদিন শুয়ে শুয়ে আপনার কথা কতখানি আমি ভেবেছি।

এনার দুচোখে দীপ্তির আভাস! এনা বললেন,—সত্যি?

—হুঁ! বললুম—জানেন সেদিনটি আমার জীবনে সবচেয়ে বড় দিন, যাকে বলে red letter day. সেদিনের কথা জীবনে আমি ভুলবো না!

আবেশে এনার দুচোখ এলো ভরে,' এনা বললেন—আমার জীবনেও সেদিনটি, সত্যি বলচি, wonderful. মোটরে সেই অতদূরে যাওয়া—হাসি গল্প গান! জানেন, আপনাকে আমার কত ভালো লাগে। যে আসে আমার কাছে সে-ই শুধু বলে, আহা! আমার সঙ্গে আর কোনো কথা নয়। ভাবে, এর সঙ্গে কি কথা কইবো। রোগে ভুগছি চিরদিন—কোনো কালে যে সারবে না—তার আবার কি কথা আছে বলবে, কি কথাই বা সে শুনবে! আপনি শুধু আহা-উহু করেন না—আমার সঙ্গে কত কথা কন—সত্যিকারের বন্ধু, কতকালের বন্ধু যেন! আপনি আহা-উহু করেন না বলে—আপনি এলে আমার এত ভালো লাগে—আপনি যতক্ষণ থাকেন, নিজেকে আমার সুস্থ মনে হয়, আমি তখন সত্যি ভুলে যাই যে আমি চিররোগী, অত্যন্ত অসহায়, জীবনে আমার এ রোগ সারবে না।

আমার মন হলো দরদে বিগলিত। আমি বললুম—থাক ওসব কথা। কে বলেচে, আপনার অসুখ সারবে না? আপনি সুস্থ হবেন না? ডক্টর মজুমদারের এই নতুন ট্রীটমেন্ট ...

বাধা দিয়ে এনা বললেন—আপনার বিশ্বাস, এ ট্রীটমেন্টে আমি সারবো? বলুন—আপনার কথায় আমার খুব বিশ্বাস আছে, আপনি যদি বলেন ...

বললুম—সারবেন, আমার বিশ্বাস।

—কিন্তু কবে? কবে? জীবন আমার মরুভূমি হয়ে আছে। আপনি বুঝবেন না, বুঝবেন না যখন একলা পড়ে থাকি, চারিদিকে দেখি ঘন ঘোর অন্ধকার, আর কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন দেখি না! বলুন আপনি, কবে সারবো? কতদিনে? কত মাসে? কত বছরে?

কণ্ঠে আবার উত্তেজনার আভাস!

বললুম—থাক, এ কথা বুঝবেন না এখন!

—না, কইবো আমাকে বলতেই হবে। আপনি যা বলবেন, আমি বিশ্বাস করবো। আপনার এই কথাটুকুর উপর নির্ভর করে' আবার আমি ধৈর্য ধরতে চাই, নাহলে আমি আর পারছি না ...

আমি বললুম—এক বছরের মধ্যেই—আমার তাই বিশ্বাস। কিন্তু আপনাকে খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকতে হবে!

এনা চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন—লক্ষ্মী হয়ে লাভ?

কণ্ঠ উদাস।

আমি বললুম—আছে লাভ। লক্ষ্মী হলে আমরা আসবো, অনেক কথা কইবো, গান গাইবো ...

—শুধু এই ?

—বলুন আর কি চান আপনি ?

—দেবেন ... কথাটি বলে' একখানা হাত প্রসারিত করে দিলেন এনা ... প্রসারিত করে' আমার হাত ধরলেন—ধরে' বললেন—চুপি চুপি বলবো

কথাটি বলে' কি সলজ্জ আকুল দৃষ্টিতে চাইলেন ... সে দৃষ্টিতে আমি বিমুগ্ধ বিবশ হলুম ...

মৃদু কণ্ঠে বললুম—বলুন।

দুহাতে আমাকে টেনে আমার মুখখানা নিজের মুখের কাছে আনলেন—যেন কি বলবেন, শুনবো বলে আমি মুখ নামালুম।

এনা কিছু বললেন না, মাথা তুলে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার মুখে চুম্বন ...

আমি বিবশ বিহ্বল—নিজেকে সম্বরণ করতে পারলুম না ... আমিও করলুম চুম্বন—এনার অধরে।

প্রায় একমিনিট। দুজনেই যেন বিবশ, চেতনাহারা—হঠাৎ আমার মুখখানা সরিয়ে দিয়ে নিশ্বাস ফেলে এনা বালিশে মুখ গুঁজলেন ...

আমার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ, উঠে দাঁড়ালুম। বললুম—আজ আসি !

এনা মুখ তুললেন—মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, দুচোখে আবেশ, এনা বললেন—রাগ করেছেন ?

—না।

আমার দু'খানা হাত এনা ধরলেন চেপে, বললেন—আবার আসবেন।

—আসবো।

১২

ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম—স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো! সদর ফটকের দিকে চলেছি, হঠাৎ ডাকলেন মীরা—লেফটেনাণ্ট গাঙ্গুলী!

থমকে দাঁড়ালুম, মীরার পানে তাকাতে পারলুম না। মনে হলো, যেন আমি সকলের বিশ্বাস ভঙ্গ করে' মস্তবড় অপরাধ করে সভয়ে সরে পড়ছি! এ বাড়ীর ঐশ্বর্য যেন বিশ্বাস করে এঁরা আমার সামনে রেখেছিলেন, আর আমি এঁদের অসাক্ষাতে সে ঐশ্বর্য চুরি করে' নিঃশব্দে সরে যাচ্ছি।

মীরা বললেন—বেশ ঠাণ্ডা দেখলেন তো?

মাথা নেড়ে মৃদু কণ্ঠে বললুম—হ্যাঁ!

মীরা বললেন—একটু বসবেন না?

বললুম—অনেকক্ষণ আছি আজ, মানে ···

—বেশ তা হলে ধরে রাখবো না!··· কাল আসবেন তো?

—হুঁ!

—হ্যাঁ, আসবেন নিশ্চয়।

ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলুম। এলুম ব্যারাকে—সারা পথ পায়ে হেঁটে।

মাথার মধ্যে যেন একরাশ বোলতা, না, মৌমাছি ভনভন করছিল। চোখে সব দেখছি অথচ সে দেখার ছবি মনে একটা রেখাও টানছিল না ···

রাত্রে বিছানায় শুয়ে চোখে ঘুম আসে না। অপরাধের গ্লানি যেন

মনে ছুঁচ ফুটোচ্ছে! ওখানকার ঘটনা ... পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে লাগলুম। নিজের মনের বিচার করছি—খুব নিরপেক্ষ জজের মতো।

মনকে দুর্ব্বলতার দায়ে অপরাধী করতে পারলুম না। না, না এনার উপর আমার মনে কোনোদিন এতটুকু লোভ জাগে নি—এখনো না। ওঁকে শুধু মমতাই করেছি, করুণা... অনুকম্পা। রুগ্ন, বেচারী অসহায় বলে' মন বার বার হায় হায় বলেছে। এবং কথা কয়ে গান গেয়ে এতটুকু দুঃখ দুশ্চিন্তা যাতে ভুলোতে পারি তাই শুধু করেছি। ওখানে নিত্য এই যাওয়া, কিশোরী এনার রূপের লোভে নয়—প্রসাদের লোভে নয়, যাওয়া শুধু অনুকম্পা বশে! মনকে আরো গভীর, আরো তীব্র ভাবে বিশ্লেষণ করলুম। কারো রূপে, কারো কিশোর পুষ্ট দেহের উপরে যদি মোহ জেগে থাকে, লোলুপতা জেগে থাকে তো সে মীরার, এনার নয়, এনার নয়। ওখানে মীরার সঙ্গে কতটুকু বসি, কতটুকু মেলামেশা করি, কটাই বা কথা কই—সব সময় এনার সঙ্গে, এনার সাহচর্যে মীরা থাকে যেন নাটকের নায়িকার পাশে সখীর মতো, চকিতে এসে নায়িকার পাশে দাঁড়ায়। চকিতে যায় সরে—এনাই সব।

কিন্তু সেই এনা—যাকে কেবল অসহায় রোগিণী বলে দেখে আসছি, জেনে আসছি, সে যে কিশোর বয়সের মেয়ে, তার দেহে বসন্ত জেগেছে, তার মন আছে—কিশোরীর সদ্য জাগ্রত মন—সে মনে বাসনা জেগেছে, একথা একটি মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হয়নি। এনা আমার সঙ্গ চায়, সাহায্য চায়। আমি ভাবতুম, আমি তার সঙ্গে রোগের কথা না কয়ে নানা কথা কই, গান গাই—এরই জন্যে আমাকে এনা দেখেন বন্ধু বলে। সমবয়সী স্ত্রী-পুরুষ লিপ্সাহীন বন্ধুত্ব

সম্ভব, এ ধারণা আমার মনে ছিল দৃঢ় সংযুক্ত, চকিতের জন্ত আমার মনে সন্দেহ জাগেনি যে আমার এ অনুকম্পাকে এনা ভাবছেন···না হলে কিশোর বয়সের মেয়ে, একান্ত সবল মনের মেয়ে—আজ চকিতে তার এ দুর্ব্বলতা জাগতো না। আমার দিক থেকে কোন রকম চাপল্য প্রকাশ পায়নি। যে সব কথা কয়েছি, তার কোনো টুকরো থেকে এনা হয়তো বুঝেছিলেন, না হলে আর প্রগলভ মুখর হয়ে আদর প্রার্থনা আর অযাচিত ভাবে চুম্বন ··· আমার শিরায় শিরায় বইল উষ্ণ রক্ত স্রোত! প্রেম, ভালোবাসা—কাব্যে উপন্যাস নাটকে ভালোবাসার কথা, প্রেমের কথা, অনেক পড়েছি, কিন্তু গরীবের ঘরের ছেলে, বাইরে এমন কোনো পরিবারের কিশোরী রূপসী কন্যার সংস্পর্শে আসিনি যে, কাব্য-পড়া ঐ প্রেম নিজে উপলব্ধি করবো নিজের জীবনে। পথে-ঘাটে বহু কিশোরী চোখে পড়েছে, তাদের মধ্যে কারো মুখ, কারো রূপ চোখে ভালো লেগেছে, সে ভালো লাগার দরুন হয়তো তাদের পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছি, কখনো দুবার পর পর ফিরে ফিরে তাদের পানে চেয়েই দেখেছি! কিন্তু সে ঐ চোখে দেখা, নয়নের তৃপ্তি সাধন! সে রূপ, সে-মুখ যাদের, তাদের কানে কানে গুঞ্জরণ তুলবো—

আমার পরান যাহা চায়
তুমি তাই, তুমি তাই গো—

কিম্বা নিশীথ শয়নে সে মুখ, সে রূপের চিন্তায় উতল হয়ে ভেবেছি—

তার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে
হারিয়েছি মোর মন,—
তারে কাছে পেতে, পাশে পেতে
চাই গো অনুক্ষণ—

এমন আমার জীবনে কখনো ঘটেনি! অন্নদাবাবুর বাড়ীতে সব প্রথম বিলাস-ঐশ্বর্যের মধ্যে দুটি রূপসী কিশোরীর সঙ্গে আমার দেখা! শুধু দেখা নয়, বেশ বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গতা, তবু অকপটে স্বীকার করছি, মীরাকে দেখে মন আমার বিহ্বল হয়েছে, বিবশ হয়েছে। এমন কথাও মনে জেগেছে, ঐ মীরা যদি আমার হয়, মীরা যদি আমায় ভালোবাসে! তাও ঐ ক্ষণেকের চিন্তার টুকরা। শ্রান্ত পথিক ধনীর মোটর দেখে যেমন ভাবে, পা আর চলে না, যদি অমনি মোটরে চড়ে যেতে পারতুম! সে জানে, ও মোটরে চড়ে যাবার তার কোনো সম্ভাবনা নেই, সে সম্ভাবনা ঘটবে না, ঘটতে পারে না এবং সেজন্য মোটরের ও বাসনা তার মনে লোভ জাগাতে পারে না, মীরার সম্বন্ধে আমার মনের ভাবও তেমনি! ক্ষণিক বাসনার ফেনিল উচ্ছ্বাস, মনে সে বাসনা থিতুতে পারতো না! কিন্তু সে ঐ মীরার সম্বন্ধে! এনার সম্বন্ধে আমার মন শুধু করুণা ভরে, অনুকম্পা বশে বলেছে, আহা! এবং সেই করুণার ভরেই আমি তাঁকে সঙ্গ দিই, সাহচর্য দিই—কথায় গানে যতখানি তাকে সুখী করতে পারি, রোগের অসহায়তা আর সকাতর দুর্ভাগ্য থেকে তার মনকে সরিয়ে রাখতে পারি—এইটুকু মাত্র! কিন্তু তার আজিকার ও-আচরণ, নিজের আচরণ, সংযত করতে না পেরে নারীর লজ্জা শরম অনায়াসে ত্যাগ করে এনা! আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠলো। ছেলেবেলায় অন্ধ-সংস্কার বশে বিপদে পড়ে ভগবানকে কখনো কখনো ডেকেছিলুম—তার পর যৌবনে ভগবানের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলুম, সে রাত্রে কিন্তু সেই ভুলে যাওয়া ভগবানকে ডাকলুম—ভগবান, এ কি দায়ে ফেললে—রক্ষা করো! এ পারে না, হতে পারে না ঐ খঞ্জ রুগ্ন কিশোরীর ভালোবাসা—আমি নিতে পারবো না। অনীপ্সিত পুরুষকে নারী প্রতিরোধ করে

যৌন-নীতির রীতি মেনে, সে প্রতিরোধ, সে বিরাগকে কেউ বলবে না, নিষ্ঠুর, নির্মম! কিন্তু অনীপ্সিতা নারী যদি কোন পুরুষকে কামনা করে এবং সে কামনা লজ্জা সঙ্কোচ সরিয়ে প্রকাশ করে, তখন সে পুরুষের বিরাগ হয়ে ওঠে নারীর পক্ষে মর্মান্তিক! সে বিরাগে, সে প্রত্যাখ্যানে নারী হয় পথের ভিখারিণীর অধম! নারী তোমাকে চাইছে—দেহে মনে তোমার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে, তোমার সুখ, তোমার দুঃখ, তোমার আশা-নিরাশা—সম্পূর্ণ নিজের করে' নিতে। সে চায় নিজের দেহ দিয়ে তোমার দেহ—তোমার হাত, তোমার বুক, তোমার অধর, তোমার পৌরুষ, তোমার দিবস, তোমার রাত্রি—তোমার আবেগ, তোমার আবেশ, তোমার চিন্তা—শরম, সঙ্কোচ! নিজেকে তোমার হাতে দিয়ে সে চায় তোমার ছায়া হয়ে থাকতে; কিন্তু তা যখন হয় না, নারী তখন সম্পূর্ণ নিরবলম্ব হয়—সে দাঁড়াতে পারে না, বাঁচতে পারে না। এনার ঠিক তেমনি অবস্থা, কিন্তু এ অবস্থায় আমি তার কি করতে পারি? দুঃখে ভাবনায় ভয়ে আমি যেন—আমার মনে হতে লাগলো এখন আমার মৃত্যু ছাড়া উপায় নেই!—এনার এ ভালোবাসা, এ মোহ—আমার পক্ষে কতখানি যাতনা, কত বড় গ্লানি হয়ে উঠলো—কাঁটার মতো এ চিন্তা আমাকে সব সময়ে বিঁধতে থাকবে অথচ ভগবান জানেন, এ যাতনা আমাকে ভোগ করতে হবে সম্পূর্ণ বিনা কারণে—আমার বিনা অপরাধে!

স্থির করলুম, ওবাড়ীতে আর যাবো না, এনার সঙ্গে আর দেখা করা নয়। আমাকে নিষ্ঠুর অমানুষ ভেবে এনা যদি আমার উপর রাগ করে, আমাকে অভিশাপে জর্জ্জরিত করে—সেও ভালো।

কিন্তু—

পরক্ষণে মনে হলো, কিন্তু যদি আমার অদর্শনে সে বড় বেশি

আঘাত পায়, সে আঘাতে যদি তার আরোগ্যের ক্ষীণ আশাটুকুও যায় চূর্ণ হয়ে!

তবু উপায় কি! হয় ওখানে যাওয়া বন্ধ করা, না হয় এনার ভালোবাসার প্রতিদান—এ দুয়ের মধ্যে রফার কোনো উপায় নেই। কাপট্য ভর করে' এনার মনকে খুশি রাখা—সে অভিনয়, আর যে পারুক, আমি পারবো না!

পরের দিন বন্ধু-বান্ধবের দলে নিজেকে আবার ভাসিয়ে দিলুম। তাস খেলা, দাবা খেলা, হোটেল, সিনেমা—এমনি ভাবে এসবে নিজেকে বেঁধে ওবাড়ীর পথ থেকে রাখলুম নিজেকে নিরস্ত!

কিন্তু তার পরের দিন আমার আরদালী এনে দিলে—বেলা তখন দশটা—আমার নামে একটা বড় প্যাকেট!…বললে—চাকারবার্টি সাবের পিয়ন এসে দিয়ে গেছে!

—চলে গেছে সে?

—জী হুজুর।

প্যাকেট ছিঁড়লুম, ভিতরে চিঠি—এনার চিঠি! কান মাথা ঝাঁঝাঁ করতে লাগলো। চিঠি পড়লুম। এনা লিখেছেন—

কাল সকাল থেকে তোমায় ছখানা চিঠি লিখেছি আর ছখানাই পড়ে ছিঁড়ে ফেলেছি। আমার মনে যা হচ্ছে, তোমাকে তা জানতে দেবো না বলে' মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি! কিন্তু আর পারলুম না—আবার তোমাকে লিখছি। যেদিন থেকে তুমি আমাদের এখানে আসছো, সেই দিন থেকে মনকে আমি বারবার শাসন করছি—নিজেকে প্রকাশ করো না—খুব সাবধান! তোমার সঙ্গে কত সময়ে রূঢ় আচরণ করেছি, তোমার উপর রাগ করেছি, বিরক্তি প্রকাশ করেছি—নিজেকে প্রাণপণে রুখে রাখবো বলে, মনকে বিযুক্ত করবো বলে—কিন্তু কি যে হয়—পারি না! আমার চোখে আলো নিবে গেছে—সে আজ কত বছর হলো, আমার পৃথিবী আমার কাছ থেকে কোথায় কত দূরে সরে

গেছে। কিন্তু তুমি আমার চোখে জ্বেলে দেছ আলো—পৃথিবীকে আবার তুমি ফিরিয়ে এনে দেছো আমার হাতে—তোমার এ ঋণ কি শুধু দেহমন দিয়ে শোধ করতে পারি?

একটা কথা শুনে আসছি ছেলেবেলা থেকে—বামনের চাঁদ ধরার সাধ! কবে কোন্ বামন এমন লোভ করেছিল, জানি না, কিন্তু আমার মনকে আমি ঐ কথা বলে বারবার ধমকেছি, শাসন করেছি—কিন্তু মন কিছুতে আমার বশ মানলো না! একটা অক্ষম, অথর্ব, খোঁড়া মেয়ে তার এ লোভ যে কতখানি দুর্বার—আমি কি তা বুঝি না ভাবো? তবু কেন এমন নির্লজ্জ স্পর্দ্ধা আমার বুঝতে পারি না। পথে অন্ধ খঞ্জ ভিখারী দেখলে লোকের মনে যে দয়া হয়, সে দয়ার মধ্যে কতখানি ঘৃণা আর অবজ্ঞা—তা আমি বুঝি। এও বুঝি, আমিও তো তাদের মতো অঙ্গহীন, পৃথিবীর বুকে অনাসৃষ্টি—বেদনার কাঁটা মাত্র—তবু একি দুর্বার লোভ আমার!

এ লোভ তো মনে জাগেনি কোনো দিন—তুমি জাগিয়েছ এ লোভ—তোমার কাছে মনকে অকপটভাবে ধরে দেবার যে নির্লজ্জতা, তোমাকে তা সহ্য করতেই হবে।

স্বপ্ন নিয়ে আমার দিন কাটছিল, কিন্তু কতকাল মানুষ স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে পারে? ওগো, যদি খঞ্জ বলে' আমায় করুণা করে থাকো, তাহলে আর একটু করুণা করে' আমার মনের ব্যথাও বোঝবার চেষ্টা করো! হয়তো তুমি কোনোদিনই আমার মনের এ পরিচয় পেতে না। বরাবর আমারো ছিল পণ—আমার মনের এ পরিচয় কোনোদিন তুমি জানবে না! একটা বাংলা গান মনে পড়ছে,—পাপড়ি ঝরে যাবার সময় পদ্ম বলছে আকাশের সূর্যকে—

রঙে রঙে ফুটে উঠি
আপনাকে যে মেলে ধরি
কার তরে হায়, আমার ফোটা—
বুঝলো না সে—খেদে মরি!

ভেবেছিলুম, পদ্মর ঐ গান বুকে নিয়েই এজন্ম দেবো কাটিয়ে। বিশ্বাস করবে—বাবা আমাকে সারিয়ে তোলবার জন্য যত আকুল হোন, যত চেষ্টাই করুন, ডাক্তার আমাকে যত আশাই দিক্—আমি জানি, আমার এ রোগ সারবার নয়! সারবার ইচ্ছাও ইদানীং ছিল না। তোমাকে দেখে অবধি, কেবলি মনে হয়েছে, সেরে উঠি [illegible]

আকাশের সমস্ত ঠাকুরকে রোজ ডেকেছি, সকালে সন্ধ্যায়—আমাকে সারিয়ে দাও, ঠাকুর, সারিয়ে দাও! পূজার অর্ঘ্য হবার যোগ্য করে তোলো আমাকে! শুধু তোমার আশায় আমার বাঁচবার সাধ—সেরে ওঠবার সাধ, নাহলে এতবড় পৃথিবীর একটি কোণে একটা মেয়ের প্রাণ—কি তার দাম? কি বা পৃথিবীর লাভলোকসান, জীবনে-মরণে?—

কিন্তু কি সব বকছি বুঝি না। মনে কথার পর কথার ভিড়, কোন্ কথাটা কিভাবে বললে, মনের আসল কথাটুকু বলা হবে—বুঝতে পারছি না।

যাই হোক, যদি কাল অবিনয় প্রকাশ করে থাকি—ক্ষমা করো, প্রিয়তম!

প্রিয়তম বলে' বড্ড ডাকতে ইচ্ছা হচ্ছে, ক্ষমা করো প্রিয়তম বললুম বলে!

আগেকার লাইনগুলো লিখেছি দুপুর বেলায়। এখন আবার লিখতে বসলুম রাত এখন নটা। তুমি এলে না। তোমার আশায় বার বার দরজার পানে চেয়েছি। বাইরে পায়ের শব্দ পাবা মাত্র চমকে চমকে উঠেছি—ঐ বুঝি তুমি এসেছো! লজ্জায় সারা গায়ে কাঁটা দেছে। কি করে' তোমার পানে মুখ তুলে তাকাবো? মেয়েদের শুনেছি লজ্জাই ভূষণ। সে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে কাল মনের আবেগে যা করেছি, সত্যি, আমি মরে গেলেও বুঝি আমার এ লজ্জা যাবে না।

কেন তুমি এলে না আজ? রাগ করেছো? লক্ষ্মীটি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি এসো, ওগো এসো! আর কখনো তোমাকে এমন অপমান করবো না। শুধু বন্ধুর মতোই তুমি এসো, ভালোবাসা নয়, করুণাই শুধু করো! ভালো না বাসো, দুঃখ নেই, তবে আমি যদি তোমাকে ভালোবাসি—ভালোবেসে আমার আশাহীন সুখহীন আলোহীন জীবনে একটু সুখ পাই, তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

বেশি নয়, একটি ছত্র লিখে শুধু জানিয়ো, আমাকে তুমি ক্ষমা করেছো। আর—আর জানিয়ো কবে আবার আসবে? তুমি না ভালোবাসো, তোমাকে ভালবাসতে দিয়ো শুধু, নইলে আমি বাঁচবো না।...

শেষের দিকে কটা লাইন চুপসে, ঝাপসা—চোখের জলে নিশ্চয়।

চিঠি পড়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো, পায়ের নীচে থেকে পৃথিবী যেন সরে গেছে মনে হলো। স্তম্ভিত হয়ে আমি বসে রইলুম।

হঠাৎ উচ্চরবে ঘরে ঢুকলো হরকিষণলাল। এসেই আমাকে দেখে

বলে উঠল—What's up with you—হাতে চিঠি—মুখখানা কাগজের মত সাদা? বাড়ীর চিঠি? খারাপ খবর আছে?

নিশ্বাস ফেলে বললুম—না, বিশেষ দুঃসংবাদ নয়।

—তাহলে এসো, আমরা ব্রিজ খেলতে বসেছি, একজন পার্টনারের অভাব—তোমাকে চাই।

কুণ্ঠিত স্বরে বললুম—না ভাই, আমাকে ক্ষমা করো, আমার মনটা upset হয়েছে একটু।

—ব্যাপার কি?

—একটু দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে।

—তাহলে যে বললে দুঃসংবাদ নয়?

—বিশেষ দুঃসংবাদ না হলেও একটু ভাববার বিষয় বটে।

—ও! যোদ্দা, তোমাকে কদিন তো লক্ষ্য করছি, something has happened to you—something unusual—

মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলুম—বাড়ী থেকে কতদূরে আছি⋯

হরকিষণ গেল চলে,' আমি চুপ করে বসে রইলুম। চোখের উপর ভাসছে এনার কাতর করুণ মূর্তি, আর আমার মনে বাজছে—চিঠির কটা ছত্র—"কিন্তু তুমি আমার চোখে জ্বেলে দেছো আলো—আমার নয়নে আজ তুমি জ্বেলে দেছো আলো, পৃথিবীকে তুমি ফিরিয়ে এনে দেছো আবার আমার হাতে—"⋯"তুমি আমাকে ভালো না বাসো⋯ভালোবাসতে দিয়ো শুধু—নইলে আমি বাঁচবো না!⋯"

ঘরের বাইরে করিডরে হৈ-হৈ অট্টরব, আরো ওদিকে কোন্ ঘরে কারা বেয়াড়া রেকর্ড খুলে দেছে, অসহ্য বোধ হলো—মনের মধ্যে একটা ঘূর্ণি ঝড় বইছে যেন, দারুণ অশ্বস্তি, কোথায় যাই? কোথায় গেলে একটু শান্তি পাই?⋯

উঠলুম, পা টলছে, মাতালের মতো টলতে টলতে ঘর থেকে বেরুলুম।

সামনে আমার আরদালী—তার হাতে চিঠি। আমার হাতে দিলে চিঠি। চিঠি দিয়ে সে চলে গেল।

খামখানা ছিঁড়ে সেইখানে দাঁড়িয়েই পড়লুম, এনার চিঠি, ছোট্ট চিঠি। এ চিঠিতে এনা লিখেছেন—

আমার আগেকার চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলবেন—ছি ছি, পাগলের মতো কি যা-তা তাতে লিখেছি যে লজ্জা হচ্ছে।

বিশ্বাস করুন—সে চিঠিতে যে সব কথা লিখেছি তা সব মিথ্যা! সত্য নয়।

এ বাড়ীতে আসবার দরকার নেই। আপনি আর এখানে আসবেন না। সে রাত্রে যা হয়ে গেছে, তার জন্ম মনকে কঠিন শাস্তি দেবো আমি। আপনি এখানে আর না এলেই খুশি হবো। আসবেন না—সত্যি আসবেন না আর।

আমার সে চিঠির জবাব দেবার কোনো দরকার নেই। চিঠি ছিঁড়ে ফেলবেন, তাতে যা লিখেছি সে সব মনে রাখবেন না। দয়া করে ভুলে যাবেন। কৃতার্থ হবো।...

সে সব কথা মনে রাখবেন না—ভুলে যাবেন! সরল বালিকার কথা—সরল কথা। যে সব কথা তীরের মতো মনকে বেঁধে জর্জর করছে, সে সব কথা ভুলে যাওয়া সাজে? না, সম্ভব? সে সব কথা মনে রাখবেন না—হায়রে, মনে যখন সে সব কথা আর যে কিছুকে দেছে চেপে পিষে ঝরিয়ে! সে সব কথা ভুলে—ঘরে জ্বালো আলো, আলো জ্বেলে একখানা ডিটেকটিভ নভেল খুলে বসো! হায়রে...একি সম্ভব? বন্দুক থেকে গুলি যাদ ছুটিয়ে দিই, সে গুলি কিছুতে গিয়ে লাগবেই—তাকে ফেরানো যায় না।

এনার কথা রেখে চিঠি ছিঁড়ে ফেললুম না—চিঠি দুখানা ভাঁজ করে পকেটে রেখে ব্যারাকের ক্লাবঘরে গিয়ে উঠলুম—সেখানে একদল সাথী

রিয়ার্শাল দিচ্ছিল একটা লক্ষ্মীছাড়া ইংরেজী প্রহসনের—অভিনয় করবে সাধ হয়েছে।

ক্লাবের আবহাওয়া বিষাক্ত মনে হলো—টিকতে পারলুম না। এতকাল এখানকার সাথীদের সঙ্গে মিশেছি—দায়ে পড়ে, কারো সঙ্গে মনের মিল হতো না তবু মিলতে হতো—নিরুপায়ে। চমৎকার আশ্রয় মিলেছিল অন্নদাবাবুর গৃহ, কিন্তু সেখানে আজ আমার যাবার পথ হয়েছে বন্ধ!—নিজেকে একান্ত নিরুপায় অসহায় একা নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগলো—এত বড় পৃথিবীতে আমি একা—একা!…সুখ দুঃখের কথা কবো এমন জন আমার আজ কেউ নেই…

বেরলুম পথে। পথ প্রায় জনহীন। একটা ছোট দোকান, দোকানে আলো জ্বলছে, দশ-বারো জন লোক বসে কড়ি খেলছে। হঠাৎ চীৎকার।

ওদিক থেকে একজন লোক আসছিল—তাল গাছের মতো দীর্ঘ দেহ, গরম কাপড়-চোপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা, কাছে এলে দেখি, আমাদেরি এক সাথী—জানকীরাম। বথামি করতে বেরিয়েছিল। এখন ফিরছে। আমায় দেখে বললে—হ্যালো, গাঙ্গুলি…

আমি দাঁড়ালুম। আমার একখানা হাত চেপে ধরে সে বললে—গদগদ কণ্ঠে—নো লাভ্, মাই ফ্রেণ্ড…একটা মেয়েকে কি ভালোই বেসেছিলাম, রোজ সেখানে যেতুম, কত rich presents দিয়েছি, একটা পয়সা সঞ্চয় করিনি হাতে … সে আজ সেফ সটকান দিলে…একটা গেঁয়ো জমিদারের সঙ্গে।

হাউ হাউ করে' জানকীরাম কেঁদে উঠল, বুঝলুম নেশা হয়েছে বেশ। বললুম—কেঁদো না। এক রাজা গেছে, আবার দোসরা রাজা জুটবে। জানকীরাম বললে—কিন্তু জানো …

আমি বললুম—আজ রাত্রে ঘুমোও গে তো, কাল সকালে চেষ্টা কর্‌বো—new pastures.

—Yes, my friend—or life is dull···

টলতে টলতে সে চলে গেল—আমি চললুম বিপরীত দিকে। কোথায় চলেছি, জানি না; শুধু চলেছি। খেয়াল হতে দেখি সামনে স্টেশন। সিগনাল পড়েছে। দেরাদূনের দিক থেকে ট্রেন আসছে! বসলুম. প্লাটফর্মের বেঞ্চে, লোকজন দেখে তাদের হাসি-গল্পে নিজের মনকে যদি মিশিয়ে দিতে পারি।

ট্রেন এলো। কত লোক নামলো—কত ট্রেনে উঠে বসলো। একটা দারুণ হট্টগোল, সকলেই ব্যস্ত—যেন কি একটা ঘটবে তার জন্তে সব অস্থির!

ঘণ্টা বাজলো—বাঁশী বাজিয়ে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল। প্ল্যাটফর্ম প্রায় খালি, ফিরিওলার দল কেনা-বেচা সেরে দূরে গিয়ে বসছে—হিসাবের কড়ি মিলুতে। বহুক্ষণ বসে রইলুম। বসে বসে কেমন অস্বস্তি ধরলো—লোকে ভাববে কি আমাকে দেখে? উঠলুম।

এখন?—ব্যারাকেই ফিরলুম।

ব্যারাকে ফিরতেই মনে হলো, উপায় আছে। সে উপায়—লক্ষ্ণৌ থেকে চলে যাওয়া!

ব্যারাকে এসে কর্নেলের সঙ্গে দেখা করলুম। তাঁকে জানালুম এখানে আমার শরীর কেমন ভালো লাগছে না—যদি আমাকে অন্ত কোনো স্টেশনে বদলি করে দিতে পারেন···

কর্নেল চাইলেন আমার পানে, বিস্মিত দৃষ্টি, বললেন—ডাক্তারকে বলেছো?

—না। মানে, মনটা এখানে কেমন লাগছে···

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন,—মিলিটারী লোকের মন বলে কোন বালাই নেই, মাই বয়, মন নয়—শুধু দেহখানা—কামানের মতো তৈরি রাখতে হবে।

আশা বিচূর্ণ হলো! ক্লান্ত পায়ে অবসন্ন দেহে নিজের ঘরে এলুম। বিছানায় পড়ে একখানা নভেল খুলে সকলের সঙ্গ এড়ালুম—বইয়ের একছত্র পড়িনি, বইখানা শুধু আমার আর দুনিয়ার মাঝখানে আড়াল তোলা!…

তার পর রাত্রি। বিছানায় শুয়ে পড়লুম—এনার চিঠি দুখানা পকেটে নিয়ে। চিঠি দুখানা বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারলুম না। যতক্ষণ জেগেছিলুম, চিঠি দুখানা পাখীর মতো কূজন করতে লাগলো—একটি কথা—আমাকে ভালো না বাসো—তোমাকে আমি ভালোবাসবো—এটুকু অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না—নইলে আমি কি নিয়ে বাঁচবো!

বেচারী—বেচারী—বেচারী—অনুকম্পাভরে আমার মন কেবলি বললে, আহা।

১৩

পরের দিন।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে জমলো মেঘ।—সেই একঘেয়ে রুটিন এখানে। তারপর অলস অবসরে ঐ এক চিন্তা! যেন কারা-প্রাচীরের মতো মনকে বন্দী রেখে যাতনা ভোগ।…

ড্রিল সেরে ফিরতেই পেলুম নোটিশ—আমাদের দলকে যেতে হবে বিধুর…ক্যাম্পিং ডিউটিতে। বেরুতে হবে লাঞ্চ খেয়ে—বেলা বারোটা—পাংচুয়ালি।

আরাম-ভরা বাতাস এলো মনে, মনে হলো, বাঁচতে পারবো এবার।

বারোটায় মার্চ্চ—লক্ষ্ণৌ থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল—এই পঞ্চাশ মাইল পথ যেতে হবে ঘোড়ায় চড়ে। পৌঁছে কানপুরের ক্যাণ্টনমেণ্টে হাজিরা দিতে হবে রাত নটায়। রাত্রে সেখানকার আর্টিলারী রেঞ্জে বাস, তারপর ভোরে উঠে বিধুর যাত্রা। দুদিন বিধুরে থেকে আবার লক্ষ্ণৌ প্রত্যাগমন।…

কানপুরে পৌঁছুলুম রাত নটায়। রাত্রে মনে বিদ্যুতের মতো জাগলো একটা কথা! কানপুরে থাকেন ডক্টর মজুমদার। আমার কানপুরে আসা—এ যেন দৈব অনুকূল হয়েছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করবো—তাঁর কাছে সব কথা বলে চাইবো ব্যবস্থা…

তাই করলুম, পরের দিন ডিউটি অফ হতেই বিধুর থেকে ঘোড়ায় চড়ে এলুম কানপুর। মজুমদারের আস্তানা পেতে বেগ পেতে হলো না—উনি নামজাদা ডাক্তার। জিজ্ঞাসা করা মাত্র হদিশ মিললো। ওল্ড

কানপুরে গঙ্গার ধারে তাঁর বাড়ী।—এলুম এক হোটেলে—সেখানে ঘোড়া রেখে একখানা টঙ্গা নিয়ে ডাক্তার মজুমদারের বাড়ী, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়…

প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড-ওয়ালা একতলা বাড়ী—জীর্ণ মতো। বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান ছিল, এখন ফটক থেকে পথ গেছে বাড়ীর সামনে গাড়ী বারান্দায়। ফটকে পিতলের প্লেটে ইংরেজী হরফে নাম লেখা—ডক্টর মণি মজুমদার।

টঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে ফটকে ঢুকলুম। সামনে ল্যাণ্ডিং, ল্যাণ্ডিংয়ে একটা রঙচটা র‍্যাকে একটা ওভারকোট ঝুলছে—একগাছা লাঠি, ছুটো জীর্ণ হ্যাট, আর একটা ছাতা! ল্যাণ্ডিংয়ে আলো নেই। বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হয়ে নামছে।…

মৃদুকণ্ঠে ডাকলুম—বেয়ারা!

ভিতর থেকে সাড়া জাগলো,—কৌন্?

স্ত্রীলোকের কণ্ঠ।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো এক দাসী, তার হাতে একটা খালি জগ।

আমি বললুম—ডক্টর মজুমদার এখানে থাকেন?

—হুঁ। জবাব পেলুম—কিন্তু তিনি এখন বাড়ী নেই, রুগী দেখতে গেছেন—সন্ধ্যার সময় ফিরবেন, বলে গেছেন। আপনি ভিতরে এসে বসুন!

আমাকে সে ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। আমি বসলুম পুরোনো একখানা চেয়ারে, দাসী চলে গেল। আমি বসে আছি, অনেকক্ষণ বসে আছি, দাসী সুইচ টিপে আলো জেলে দিয়ে গিয়েছিল। টেবিলের উপর একরাশ কেতাব, পুরোনো মাসিক-পত্র—ইংরেজী ক'খানা থ্রিলার নভেল, পাতা ছেঁড়া ক'খানা ক্যাটালগ—ডাক্তারদের

কনসালটিং রুমে অপাঠ্য সুপাঠ্য যেমন কেতাব থাকে, তেমনি। তারি একখানা তুলে নিয়ে পাতায় চোখ বুলোতে লাগলুম।

আধ ঘন্টা বসে আর ধৈর্য রইলো না—উঠে পড়লুম। এলুম ল্যাণ্ডিংয়ে, দেখি গাড়ী বারান্দায় পশ্চিমা এক বুড়ো আদমী একটা ঠেলাগাড়ী করে' একরাশ সভ্য ধোলাই করা জামা-কাপড় এনেচে।

তার সঙ্গে কথা জুড়ে দিলুম—ডক্টর মজুমদার কখন আসবেন সে জানে কি-না—

লোকটা বললে, সে ধোপা, নার্শিংহোমের জামা-কাপড় কেচে এখানে এনেছে। কম্পাউণ্ডের মধ্যে তার ঘর, সেইখানে এগুলো ইস্ত্রী করবে—ইস্ত্রী করে নার্শিংহোমে পৌঁছে দেবে—এই তার ডিউটী। সে বললে, সে জানে না, ডাক্তার সাব কখন ফিরবেন।

তার সঙ্গে এমনি কথাবার্তা চলেছে, হঠাৎ ভিতর থেকে জানালো নারী কণ্ঠস্বর—কে? কে ওখানে?

আমি জবাব দেবার আগেই ল্যাণ্ডিংয়ে এলেন এক প্রৌঢ় মহিলা বললেন—কে?

আমি বললুম—ডক্টর মজুমদারের কাছে এসেছি।

দরজার একটা কপাট ধরে তিনি চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন—কিন্তু এ সময়ে তিনি রোগী দেখেন না, বেলা চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত রোগী দেখার সময়—এখন সাতটা, দেখা হবে না আজ। কাল আসবেন।

কথা শুনে মনে হলো, নারী হিস্টিরিক…

আমি বললুম, অত্যন্ত বিনয়ের স্বরে,—আজ্ঞে, আমি অসুখের জন্য আসিনি। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ কোনো কথা আছে, তাই বলতে এসেছি। তাঁর এক রোগীর কথা।

—রোগী, রোগী, রোগী! মহিলা তুললেন ঝঙ্কার—মানুষ বসবে না জিরুবে না—রোগী আর রোগী! তাঁকে খেতে-দেতে হবে না? না, তাঁর আর কেউ নেই? কিছু নেই? শুধু রুগী রুগী রুগী! কাল রাত তখন আড়াইটে, ঘুম থেকে তুলে লোকে নিয়ে গেল—রুগী। ফিরেছেন ভোর পাঁচটায়। তারপর সাতটায় আবার বেরিয়ে গেছেন, রাজ্যের রুগী দেখে, হোম সেরে ফিরেছেন তিনটেয়, ফিরে চারটের মধ্যে কিছু মুখে দিয়ে আবার রুগী নিয়ে পড়েছিলেন। পাঁচটা বাজতে আবার বেরিয়েছেন। তোমরা কি তাঁকে এক মিনিট ছাড়বে না? এ কি অন্যায়। তাঁকে বাঁচতে দেবে না, না কি? শহরে আর ডাক্তার নেই, যে ওঁকে ঘিরে সকলে বাণ মারবে সব সময়! যাও, অন্য ডাক্তার ছাখোগে। ওঁর সঙ্গে আজ দেখা হবে না। উজবুক, স্বার্থপরের দল—ওঁকে না মেরে ছাড়বে না দেখছি! যাও, এখান থেকে। দুদিন ওঁকে শান্তিতে বাঁচতে দাও দিকিনি তোমরা!

ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলা এলেন, আমি যে ঘরে বসেছিলুম, সেই ঘরে, আমার একাগ্র দৃষ্টি তাঁর দিকে। যেভাবে আসছিলেন, মনে হলো যন্ত্রচালিত। তারপর দেখি, মহিলা অন্ধ—তবে চলে চলে এঘরের খালি জায়গাটুকু এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে, বাঁধা-ধরা লাইন ধরে তিনি যেন এলেন…

আমি অপ্রতিভ ভাবে বললুম—আপনি যা বললেন, আমি তা জানি। ওঁর বিশ্রাম দরকার। আমি চলেই যাবো, তবে একটু চিঠি লিখে রেখে যেতে চাই, দয়া করে চিঠিটুকু যদি তাঁকে দেন। কিম্বা যদি বলেন, ঘণ্টাখানেক পরেই আমি আসতে পারি।

—না—না—না! তিনি যেন ক্ষেপে উঠলেন! বললেন—আজ এক্ষণ দেখা হবে না। এসে তিনি জিরুবেন, তারপর খাবেন-দাবেন। তোমরা

এলে ওঁর না হবে জিরেন, না বসে খাওয়া। তোমার এমন জরুরি খবর নিশ্চয় নেই যে, এখনি ওঁকে না পেলে রোগী মরে যাবে। যাও, মিথ্যে আর তর্ক করো না। তুমি যাও, বলছি—

কথাগুলো বলতে বলতে অন্ধ মহিলা আমার চেয়ারের কাছে এলেন এগিয়ে—যেন রণমূর্তি—দুহাত প্রসারিত। মনে হলো আমাকে যদি কবলে পান—কি যে করবেন, ভেবে আমি শিউরে উঠলুম। আমি চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে এলুম দু'পা পেছিয়ে, এমন সময় আমার পিছনে জুতোর শব্দ। মন বলে উঠলো, ডক্টর মজুমদারই হয় তো। জুতোর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মুখে ভাবান্তর! প্রসারিত দুই হাত অঞ্জলিপুটে রূপান্তরিত হলো—কণ্ঠে মিনতি ভরে কৃতাঞ্জলিপুটে মহিলা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন—দয়া করে এখন ওঁকে আটকে রাখবেন না—ওঁর মানুষের শরীর—কখন বেরিয়েছিলেন এটুকু মনে করে', দোহাই দয়া—এটুকু দয়া করুন।

আমি স্তম্ভিত এবং এমনি সিচুয়েশনের মাঝখানে ডক্টর মজুমদার ঢুকলেন ঘরে!

দেখেই তিনি ব্যাপার বুঝেছিলেন এবং বিনা কুণ্ঠায় বলে উঠলেন—মহিলাকে লক্ষ্য করে—ও, লেফটেনাণ্ট গাঙ্গুলিকে তুমি তাহলে খাতির অভ্যর্থনা করছো বসিয়ে! হুঁ!

কথাটুকু বলে তিনি মহিলার কাছে এসে তাঁর পিঠে রাখলেন হাত, ডক্টরের সে স্পর্শে যেন জাদু, মহিলার মূর্তি হলো অন্য রকম। একটু আগে স্বামীর চিন্তায় যে অসহায়তার ভারে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, সে ভাব কেটে তিনি যেন একটু আরাম পেয়েছেন! এবং যেজন্য আরাম বোধ করে' আমি ঘরে আছি সেকথাও ভুলে গেলেন। স্বামীর হাতখানা যেভাবে চেপে ধরলেন, যেন পরম আশ্রয়—যেকে

আমার মনে হলো, স্বামীকে যতখানি পেতে চান, যেন পান না, তাই পাবামাত্র এমন করে আঁকড়ে ধরেছেন পাঁচজনে যেন স্বামীকে তাঁর কাছ থেকে না সরিয়ে নিয়ে যায়! স্বামীর ঐ স্নেহার্দ্র সম্বোধনে মহিলা বললেন ডাক্তারকে—অভ্যর্থনা নয়, ওঁকে আমি শুধু বলছিলুম যে, তুমি এলে আগেই তোমার একটু জিরেন দরকার আর খাওয়া, কখন সেই না খেয়ে বেরিয়ে গেছ, খিদে পেয়েছে তো খুব! সারা দিনে একদণ্ড বিশ্রাম মেলে না, ছুটোছুটি, রোগীদের জন্ম নানারকম দুর্ভাবনা, বাইরে বেরোনোরও বিরাম নেই, টেলিফোনের পর টেলিফোন। আজ রাত হয়ে এলো, ওঁকে বলছিলুম, কাল আসতে। কিন্তু···

ডক্টর হাসলেন এবং স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন—এঁর সম্বন্ধে একটু ভুল হয়ে গেছে মঞ্জু। ইনি আর্মিতে কাজ করেন, লেফটেনাণ্ট গাঙ্গুলি। ইনি রোগী নন, এঁর কোনো আত্মীয়ও আমার রোগী নন, ইনি আমার বন্ধু। কানপুরে ক্বচিৎ কখনো আসেন, এলে আমাদের দেখাশোনা হয়। তা ছাড়া, ওঁর হলো মিলিটারী চাকরি, সন্ধ্যা ছাড়া ওঁর যে বেরুবার অবসর মেলে না। সারাদিন ডিউটি করেন। তার চেয়ে দেখো যদি আজ রাত্রে কিছু খাইয়ে দিতে পারো তুমি।

এ কথায় মহিলার মুখ হলো স্বচ্ছ—চিন্তাহীন, কি বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথা কবার আগে আমি বললুম—না, না, সে হাঙ্গামা করার দরকার নেই, আমাকে এখনি যেতে হবে, বেশিক্ষণ বসতে পারবো না। রাত্রের এক্সপ্রেসে কানপুর ছাড়া চাই আমার রেজিমেণ্টের সঙ্গে। আমি এসেছিলুম অন্নদাবাবুদের কিছু খবর ছিল—আপনাকে জানাতে।

—তাদের বাড়ীর খবর ভালো তো?—ডক্টর করলেন প্রশ্ন। হুঁ! কিন্তু লেফটেনাণ্ট গাঙ্গুলি, একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমার স্ত্রী যেমন

আমায় বোঝেন, আমি নিজেও নিজেকে তেমনটি বুঝতে পারি না। উনি ঠিক বলেছেন—আমার খিদে যা পেয়েছে—পেটে আগুন জ্বলছে, মনে হচ্ছে, যা পাবো—সব খাবো। গলা টা-টা করছে, আগে এক পেয়ালা চা চাই, নইলে গলা দিয়ে কোনো খাবার নামবে না।

এই পর্যন্ত বলে' ডক্টর তাঁর স্ত্রীকে বললেন—মঞ্জু, তুমি চা পাঠাও নিজের তদারকীতে তৈরি করিয়ে, দু পেয়ালা। চা খেয়েই আমি উঠবো, খেতে বসবো। চা পাঠিয়ে তুমি আমার খাবার দিতে বলে দেবে। যাও লক্ষ্মীটি—a good wife···

মহিলা তাকালেন আমার পানে—অন্ধ নয়ন আমার দিকে, আমি বললুম—চায়ের পেয়ালা শেষ হবামাত্র ডক্টর মজুমদারকে আমি এক মিনিটও আটকে রাখবো না, কেন না, আমাকে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে তো।

তিনি বললেন—রাত্রে এখানে খেয়ে গেলে খুশি হতুম লেফটেনান্ট গাঙ্গুলি—দেরিও হবে না খাবার দিতে।

—না, এ যাত্রা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বললুম।

মহিলা বললেন—কিন্তু কথা দিন, আর একদিন আসবেন, এসে এখানে খাবেন।

—হুঁ···আসবেন।

মহিলা হলেন এ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত, ডক্টর তাঁর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গেলেন—একটু পরেই ফিরলেন, হাতে চায়ের পেয়ালা। তাঁর পিছনে একজন বয়, বয়ের হাতে চায়ের পেয়ালা। এ পেয়ালা আমার জন্য। আশ্চর্য হলুম—ডক্টর মজুমদার জার্মানি, ইংলণ্ড দু জায়গায় বড় বড় এগজামিন পাশ করা ডাক্তার, সাহেবীয়ানায় অনেক দেশী-সাহেবের মাথায় চড়ে বসতে পারেন, কিন্তু কোনো চাল নেই। চা

নিয়ে এলো পেয়ালায় ভরে' বয়, আমাদের মতো সাধারণ বাঙালী ঘরে যেমন বন্ধু-সভায় চা পরিবেশন হয়, তেমনি ভাবে, ট্রে, ট্রের উপরে কেটলি পেয়ালার সরঞ্জাম নিয়ে উর্দি পরা বয়ের নামগন্ধ নেই।

চায়ের পেয়ালা নিলুম হাতে। ডাক্তার বললেন—বিশ মিনিট ছুটি দাও লেফটেনান্ট গাঙ্গুলী, খেয়েই আসি। উনিও নিশ্চিন্ত হবেন, আমরাও নিশ্চিন্ত। তোমার ট্রেন ছাড়বে রাত নটায়, আধঘণ্টা ধরে বলবো, আধ ঘণ্টাতেই আমাদের কথা শেষ হবে আশা করি। তুমি এক কাজ করো—ঐ আর্মচেয়ারে আরাম করে বসো। তোমার চেহারা যা দেখছি, মনে হচ্ছে, খিদে পেয়েছে খুব, কিছু খাও—টুকিটাকি—দুখানা কাটলেট, একটু দুধ, টোস্ট আর একটু পুডিং। তুমিও ক্লান্ত, আমিও তাই। পেটে কিছু পড়লে দুজনেই হবো চাঙ্গা। আর কথা তখন জমবে, না হলে পেটে খিদে থাকলে কথাবার্তা জমবে না, দুজনেরই fresh আর clear-headed হওয়া দরকার।

বলতে বলতে হঠাৎ হলেন উৎকর্ণ, বললেন—গিন্নী আসছেন, তুমি কিছু না খেলে উনি সোয়াস্তি পাবেন না, তাই অনুরোধ করছি।

মজুমদার বিচক্ষণ ডাক্তার, তাঁর চোখ আমার ক্লান্তি নিয়েছে বুঝেছিলেন। তিনি একথা বলবার আগে আমি বুঝতেও পারিনি আমার ক্লান্তির পরিমাণ। তিনি পেয়ালা হাতে চলে গেলেন, আমি চা খেতে খেতে ঘরের চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম। দুটো কাঁচের আলমারি, সে আলমারিতে কত রকম যন্ত্রপাতি ঠাসা। কোণে বড় একটা যন্ত্র, এতবড় দুটো চাকা লাগানো, আর বই—অসম্ভব মোটা মোটা বইয়ের গাদা। ভাবছিলুম, কখন পড়েন? চব্বিশ ঘণ্টাই তো রোগী নিয়ে ব্যস্ত। এই সঙ্গে আরো নানা চিন্তা। হঠাৎ মনে পড়লো আমার এক বন্ধুর কথা—জগদীশ! কী দুর্বল ছিল। ফ্যাকাশে মুখ, কিন্তু ভারী ভালো মন। তার সঙ্গে কী ভালোবাসাই না ছিল আমার। দিনের বেলায় কিরকম চুপচাপ থাকতো, কলকাতার মেশে থেকে লেখাপড়া করতুম আমি, এক কামরায় থাকতুম দুজনে। রাত্রে আলো নিবিয়ে দুটি তক্তাপোশে দুজনে শুয়ে পড়তুম। এবং সেই অন্ধকারে তার কথার আর অন্ত থাকতো না। ভবিষ্যতের ক[illegible] স্বপ্ন রচনা করতুম দুজনে তখন, কে কি অন্যায় করেছে অকপটে তা সেই অন্ধকারে করতুম পরস্পরের কাছে স্বীকার। মনে হলো, এখন ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে ডাক্তারকে অকপটে বলবো খুলে আমার মনের অবস্থার কথা।

ডাক্তার এলেন, কোনো রকম ভূমিকা না করে' বললুম তাঁকে এনার কথা, চিঠি দুখানা দেখালুম। আমার মনের কথাও তাঁকে বললুম খুলে,

বললুম—শুধু অনুকম্পা, ভুলেও কোনো দিন এনাকে ভালোবাসিনি, ভালোবাসার কথা মনে জাগেনি, নাটক নভেলের নায়করা নায়িকাদের যেমন ভালবাসে, তেমন ভালোবাসা। এখন কিন্তু ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে—উপায় বলে দিন ডক্টর মজুমদার।

ডাক্তার যেন গর্জন তুললেন, বললেন—হুঁ। আমি ঠিক এইটেই অনুমান করেছিলুম—নাহলে এনার হাবেভাবে চেহারায় স্বাস্থ্যের দীপ্তি দেখতুম না। আমাদের ট্রিটমেন্ট দেবার আগে যা কোনোদিন ঘটেনি—তোমার আবির্ভাবে তা ঘটেছে! আমি বুঝেছিলুম, একটা কিছু ভিতরে ভিতরে ঘটেছে। এনার এখন যা বয়স এই বয়সেই মেয়েদের মন হয় ভালোবাসার জন্য আকুল—তবে এক্ষেত্রে মুশকিলের কথা হলো এই যে, this happens to the girl with such violence.

চেয়ার ছেড়ে তিনি উঠলেন, উঠে চিন্তাকুলভাবে পায়চারি করতে করতে বলতে লাগলেন—ঠিক যখন ঠিক করেছি ওকে দেরাদুন পাঠাবো চেঞ্জে, দু-চার মাস সেখানে রাখবো ওকে! This is dreadful. এখন যা হলো তা থেকে স্বয়ং বিধাতা পুরুষেরও সাধ্য নেই এনার মনকে একটু টলাবেন, তোমার এবং আমার—দুজনের দায়িত্ব এখন বাড়ল কতখানি ভাবো তো গাঙ্গুলি!

আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো! আমার অপরাধ? আমার উপর এর দায় চাপানো? যাই হোক, নিজেকে আমি এ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চাই। আমি বললুম—আপনি ঠিক কথা বলেছেন, কিন্তু এর ফল যে সাংঘাতিক। এ পাগলামির প্রশ্রয় দেওয়া নয়, আপনাকে কড়া হাতে ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি তাকে বলবেন বুঝিয়ে, অসম্ভব—এ অসম্ভব!

ডাক্তার বললেন—কাকে কি বলবো আমি?

বললুম—কেন, বলবেন এনার এ মোহ—এ একেবারে childish nonsense. আপনি তাকে বুঝিয়ে বলবেন দয়া করে।

—আমি তাকে বলবো এ কথা বুঝিয়ে! ডাক্তার বললেন—Tell her out of what? স্ত্রীলোককে বলবো অন্য যুবককে দাও তোমার এ ভালোবাসা! তাকে বলবো, she ought not to feel as she does feel? Not to love when she does love. এ কথা বলা, আর তার মাথায় মুগুর মারা এক, তা বোঝো? তাকে বলতে হবে—তুমি খোঁড়া, তুমি অঙ্গহীন, অতএব ভালোবাসার অধিকার তোমার নেই? তুমি শুধু পড়ে পড়ে রোগ ভোগ করো আর প্রেম-ভালোবাসার কথা স্বপ্নেও কখনো ভেবো না! এই কথাই আমাকে বলতে বলচো? কিন্তু এ কথা বললে তার পর এর কি glorious effect হবে, ভেবেচো?

সে কথায় কর্ণপাত না করে' আমি বললুম—কিন্তু আপনি ছাড়া কে আর···

বাধা দিয়ে তিনি বললে—আমি! আমার অপরাধ? এনার এ দায় এখন তোমার।

—কিন্তু আমি কি করে' বলবো বলুন—আমি বললুম।

—বটে! তুমি কি করে বলবে! তাকে প্রমত্ত ক'রে তোলবার সময় এ চিন্তা করোনি কেন বাপু? কিন্তু যাক, যা হয়েছে বুঝলুম, তবু তোমার মুখে তাকে নিন্দে করবার কথা চলতে পারে না—ঠিক তার ফল সাংঘাতিক···

—এনাকে এখনি কিন্তু বুঝিয়ে বলা দরকার—some one has got to make her see···

—See what? স্পষ্ট করে' আমাকে বলো।

—মানে, অর্থাৎ তাকে বোঝানো দরকার, এ একেবারে hopeless—অসম্ভব এবং সেজন্য she wont…

আমার কথা হলো এই—কি করে কি কথা দিয়ে বোঝাবো আমি, আর যা চাই কি করে তা হতে পারে।

আরো দু-চারটে অসম্বদ্ধ কথার পর আমি বললুম—একমাত্র উপায় হলো, এখান থেকে আমার চলে যাওয়া—অফিসারদের ধরে' বদলি হয়ে যাওয়া—

ডাক্তার বললেন—ঐ চিঠি দুখানির জন্য তুমি চাও তোমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব আর প্রীতির সম্পর্ক সে সম্পর্ক একেবারে কেটে দিতে ?

কি জবাব দেবো ? মনের মধ্যে যেন হাজার কণ্ঠের কলরব। ডাক্তার আমার মুখের পানে চেয়ে নিরুত্তর—নীরব! অনেকক্ষণ। তার পর তিনি বললেন—হঠাৎ এখন সরে গেলে তার পরিণাম now that you've turned the girl's head with your precious pity ?

আমি কোনো জবাব দিলুম না।

ডাক্তার বললেন—সরে পড়াটা হবে অত্যন্ত অভদ্র কাপুরুষতা, ভাবতে হবে, প্রথমে এক সরলা বালিকার জীবন—এক্ষেত্রে ভয়ানক সতর্ক হতে হবে—আঘাতে না তার জীবনটাকে চূর্ণ করে দিই ! এখন তোমার পালানোর মানে তাকে হত্যা করা—it would be murder. হুঁ, murder ! তুমি ভাবো, রোগে ভুগে ভুগে মন যার নির্জীব, hysteric হয়ে উঠেছে যে, একটুতে যে অভিমানে সারা হয়—কতখানি বেচারী সে। সুস্থ সবল মেয়েও এমন মন নিয়ে প্রত্যাখ্যান বা বিরাগ পেলে আত্মহত্যা করে—আর এনা ? বেচারী সারবার জন্য আকুল শুধু ভালোবাসবে বলে—the hapless forlorn ceature, তুমি ভাবো she

would get over it ? প্রত্যাখ্যানের আঘাতে যদি বা বাঁচে—এ গ্লানি আর লজ্জার হাত এড়াতে সে আত্মঘাতিনী হবে নিশ্চয়। এতখানি humiliation কোনো স্ত্রীলোক সহ্য করতে পারে না—নিজে প্রগলভ হয়ে লজ্জা শরম বিসর্জন দিয়ে মনের অতি গোপন কথা বলেছে, এক্ষেত্রে তোমার সরে পড়া শুধু cowardice নয়, তা হবে vile wilful murder.

আমার ললাট হলো স্বেদসিক্ত, বুকের মধ্যে যেন কে মুহুর্মুহু কামান দাগছে!

ডাক্তার আবার বললেন—বলো আমার কথায় 'না' বলতে পারো? তুমি যে নিজে ঢুকেছো সৈনিক, তোমার সাহস থাকা চাই দুর্জয় রকমের। কোন কিছুর ভয়ে পেছ-পা হওয়া সৈনিকের উচিত নয়, আমি দেখতে চাই—something of that courage which you profess as a soldier.

নিশ্বাস ফেলে আমি বললুম—কিন্তু আমাকে দয়া করে বলে দিন, আমি কি করবো এখন? আমার কর্তব্য? বিশ্বাস করুন, আমার মনের কোণেও এ ভাব জাগেনি কথনো—আর জ্ঞানত আমি এনাকে এতটুকুও প্রশ্রয় দিইনি—না, না, না, I can't, I won't and I can't. আমার কণ্ঠ বেশ তীব্র রুক্ষ হয়ে উঠেছিল শেষের কথাগুলো বলবার সময়।

ডাক্তার আমার পিঠ চাপড়ালেন, বললেন—আস্তে আস্তে, নাটক নয়।—বলে তিনি সিগার ধরালেন, বললেন—তোমাকে রোগীর মতো চিকিৎসা করা দরকার। বসো একটু চুপ করে', মাথা ঠাণ্ডা করো। একটা কথা মনে রাখতে হবে, তুমি groan করছো—I can't, I can't—কিন্তু ভুলে যেয়ো না, তুমি উপন্যাসের নায়ক নয়, এনাও

উপন্যাসের নায়িকা নয়, দুজনেই সজীব, রক্তমাংসের জীব, ছুই বললে কিছু করা চলে না। এনা তোমাকে ভয়ানক রকম ভালোবেসেছে—এ হলো fact, কেমন তো? তা, এর জন্য তোমায় এমন horrified হবার কারণ কি, জানতে পারি?

আমি তাকালুম ডাক্তারের মুখের পানে—কি জবাব দেব, ঠিক করতে পারলুম না।

ডাক্তার বললেন—তাড়া নেই, আর এতে লজ্জারও কিছু নেই। হঠাৎ আচম্‌কা একটি মেয়ে যদি ভালোবাসার বন্যায় কাউকে ডুবিয়ে দেয়, তাহলে naturally মানুষ তাতে upset হয়, মানি। মেয়েমানুষ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে ভালোবাসা জানালে পুরুষের মন চম্‌কে ওঠে—যে ক্ষেত্রে পুরুষ ভালোবাসার কল্পনাও করে না—এ'ও আমি মানি! কিন্তু তুমি ভয়ানক upset হয়েছে বলে আমি জানতে চাই, তোমার এমন বিভীষিকার কারণ কি এতে?

—বিভীষিকা!

হুঁ। মানে, এনা—তার ঐ দুরারোগ্য ব্যাধি, খঞ্জ, অঙ্গহীন—মানুষের বার হয়ে আছে, এরি জন্য তোমার এতখানি বিরাগ, feeling of physical disgust?

—না। আমি বললুম—তা নয়। তবে ও অঙ্গহীন, একেবারে অসহায়, এর জন্য তার উপর করুণা বলুন, অনুকম্পা বলুন—এর সীমা নেই। এনার কথা অনেক সময় ভাবি, ওকে হামেশাও দেখতে চাই। সে শুধু অনুকম্পা বশে। বেচারীকে যদি কথায় গল্পে হাসি গানে দুরন্ত রোগের কথা ভুলিয়ে রাখতে পারি, এইজন্য শুধু। বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই।

ডাক্তার বললেন—বেশ, আমি ডাক্তার, মানুষের নানা রকম

বিকৃতি, নানা ব্যাপার সম্বন্ধে আমার অনেকখানি অভিজ্ঞতা আছে, স্বীকার করো নিশ্চয়। স্ত্রী-পুরুষের কোনো রকম অঙ্গবৈকল্য থাকলে যদি পরস্পরের মনে বিরাগ জন্মায়—সত্য, কিন্তু অঙ্গবৈকল্যের জন্য জীবনযাত্রায় অশান্তি ঘটবেই—এ কথা আমি মানি না। অঙ্গবৈকল্যের জন্য মনে aversion ঘটে, ঘটা স্বাভাবিক—[illegible] যখন তোমার ক্ষেত্রে নয়, তখন এত বিরাগ কেন তোমার?

আমি ঘামতে লাগলুম—জবাব দিলুম না।

ডাক্তার বললেন—তোমার বিরাগ এ[illegible] অঙ্গবৈকল্যের জন্য নয়—এর পরিণাম চিন্তায় এ বিরাগ! অপরে [illegible]লে কি বলবে, এই জন্য নয় কি? তা যদি হয় তো এ বিরাগের কারণ তোমার মনের দৌর্বল্য, সাহসের অভাব, ভয়, লোকে তোমাকে ridicule করবে—এই তো?

ডাক্তারের এ কথাগুলো আমার মনে বিঁধলো তীক্ষ্ণ কতকগুলো তীরের মতো। অন্নদাবাবুর ওখানে আমি নিত্য যে যাই, এ কথাটা আমার রেজিমেন্টের সঙ্গীদের কাছ থেকে প্রাণপণে আমি গোপন রাখতে চেয়েছি! দু-একজন এ নিয়ে আমাকে শ্লেষ করেছে—সে শ্লেষ আমাকে রীতিমত বিঁধেছে।

ডাক্তার বললেন—লজ্জা নয়, বলো। সঙ্গী, বন্ধু এদের শ্লেষ বিদ্রূপকে আমরা যে ভয় করি, তার কারণ গতানুগতিক থেকে সভয়ে সরলে সেটা অনেকের অদ্ভুত লাগে। আমার স্ত্রীকে আজ দেখলে তো! উনি অন্ধ, ওঁকে কেন আমি বিবাহ করেছি, কেউ তা বুঝবে না! বলে, ডাক্তারটা পাগল। মেয়ের অভাব নেই দেশে, তবু ডাক্তার ঐ অন্ধ স্ত্রী বিয়ে করলো কেন? অসূর্যম্পশ্যা রূপসীও নন যে রূপের মোহে বিবাহ করেছি! মানুষ সাধারণত অন্ধ মেয়ে বিয়ে করে না।

আমি করেছি, লোকের লাগলো চমক। বন্ধুরা বললেন—অন্ধ মেয়ের বহু টাকা, সেই টাকার লোভে আমি ওঁকে বিবাহ করেছি। আমার মা, গর্ভধারিণী মা—জানো, দুটি বছর আমার স্ত্রীর মুখদর্শন করেননি। আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে' তিনি এক নামজাদা বংশের মেয়ে পছন্দ করেছিলেন, রূপসী মেয়ে, বহু টাকা পেতুম। সে মেয়ে ছেড়ে এক অন্ধকে বিয়ে করা, মা ভয়ানক রাগ করেছিলেন। আমি এই স্ত্রী নিয়ে একদিনের জন্য তো অসুখী হইনি। আমার উপর আমার স্ত্রীর কি নির্ভর, কি বিশ্বাস, ভালোবাসেন আমাকে কতখানি! একে বিবাহ করে' আমি পরম শান্তিতে আছি—এ কথা দুনিয়ার কেউ জানে না। জীবন কি স্ত্রীর অঙ্গবৈকল্যে মিথ্যা হয়ে যায়? ভুল—জীবনে মানুষের কত কাজ আছে, কত উদ্দেশ্য—সে কাজ, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারলে সুখের শান্তির সীমা থাকে না, জীবন হয় সার্থক!

ডাক্তারের কণ্ঠ আবেগে বিজড়িত, গম্ভীর। আমার বুকখানা দুলে উঠলো ওঁর কথায়।

নিশ্বাস ফেলে আমি বললুম—কিন্তু সব মানুষের সমান শক্তি নয় ডক্টর মজুমদার। সবার শক্তির লিমিট আছে। আপনি বিশ্বাস করুন, আমার মনে ভয় নয়—সাহস আছে, আর আপনি সৈনিক বলে' কথা তুললেন যখন, তখন বলছি, সৈনিকের word of honour, ভয়ের জন্য আমার বিরাগ নয়, আমি যা করবো, আপনাকে দেখাই একখানা চিঠির মুসাবিদ করে' রেখেছিলুম পকেটে, অফিসারের নামে চিঠি, এখানে আমার শরীর সুস্থ থাকছে না, হয় আমায় বদলি করে দিন অন্য কোথাও, নাহলে দয়া করে' আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে অনুগৃহীত করুন।

ডাক্তার পড়লেন সে চিঠি। দেখে তিনি বললেন—হুঁ! এসব

বুঝলুম। কিন্তু আমার একটা কথার জবাব দিও: এর পরিণাম ভেবে দেখেছো? নেবে সে responsibility.

বুকের মধ্যে আবার সেই কামান দাগা! ডাক্তার বললেন—এনার মৃত্যু তোমার কামনা?

—না, না, না! আমি প্রায় কেঁদে ফেললুম।

ডাক্তার বললেন—এ চিঠি তাহলে ছিঁড়ে ফেলি?

মাথা নেড়ে সায় দিলুম, চিঠিখানা ডাক্তার ছিঁড়ে ফেললেন।

চিঠি ছিঁড়ে তিনি বললেন—এখন শোনো আমার কথা। আমি এনাকে রাজী করিয়েছি দেরাদুনে যেতে। তোমার জন্যই সে যেতে রাজী হয়েছে। দেরাদুনে দু-তিন মাস থাকবে আর এই নতুন ট্রিটমেণ্ট চলবে—তাহলেই সেরে উঠবে—একথা সে বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করেছে শুধু এক কারণে—সেরে তোমার যোগ্য স্ত্রী হতে পারবে বলে, তুমি শুধু আমায় একটু সাহায্য করো—এনাকে যদি সারিয়ে তুলতে পারি। এ শুধু তার বিকল spinal cord-এর চিকিৎসা নয়, সমস্ত শক্তি নিয়ে দেহের ব্যাধি সারানো নয়—এর সঙ্গে চাই এনার মনের যোগ। ওর মন যাতে ভালো থাকে, আশায় রঙীন হয়, তা করতে পারলে আমাদের আশা সফল হবে বলে' মনে করি। তাই তোমার সাহায্য চাই ওর মনকে আশার রঙে রাঙিয়ে রাখতে। দেরাদুনে যাবার দিন আমি ঠিক করে দেবো—এক হপ্তা পরে। এই এক হপ্তা শুধু তুমি তোমার গানে গানে কথায় বার্তায় এনাকে বোঝাবে, তার এ ভালোবাসা মিথ্যা হবে না, বিফল হবে না। তুমিও তাকে ভালোবাসো এবং সে সেরে উঠলে দুজনের হবে বিবাহ, অর্থাৎ অভিনয়—এ অভিনয় করতে বলছি একটি জীবন রক্ষা করতে। This one week of your অভিনয় when the life of a human being is at stake.

নিশ্বাস ফেলে আমি বললুম—কিন্তু তার পর?

ডাক্তার বললেন—সেকথা এখন ভাববোও না! ছাখো, কোনো রোগীর টিউমর হয়েছে—আমি চাই সে টিউমর অস্ত্র করে' সারাতে। তখন আমি এ কথা ভাবি না যে দু-তিনমাস পরে আবার ওখানে যদি টিউমর গজায়! আমাদের কর্তব্য, সব সময় to act without hesitation, এ ছাড়া মানুষের অন্য গতি নেই, গাঙ্গুলি! জানো গীতায় ভগবান বলেন, কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। একটি হপ্তা শুধু তোমাকে নিষ্ঠাভরে হুঁশিয়ার হয়ে অভিনয় করতে হবে—manfully and resolutely. ছাখো, পারবে?

খানিকক্ষণ ভাবলুম, ভেবে জবাব দিলুম—পারবো।

—বাঁচালে আমাকে! আর একটি কথা, ডাক্তাররা জ্যোতিষী নন, ভগবানও নন। পরে কি হবে তা বলতে পারি না—তবে ক্ষেত্রে কর্মে বিধিয়তে। তবে আমি যা বলছি, ধরো যদি এমন হয় যে অভিনয়ে তোমার ধৈর্য থাকবে না—কিম্বা এনার মনে সংশয় জন্মেছে বোঝ, তা হলে অবিলম্বে আমাকে তা জানাবে। খুব সাবধানে, একটু বেহুঁশিয়ারিতে সর্বনাশ হতে পারে। মনে রাখবে সব। এখন চলো, দুজনে বসে অনেকক্ষণ কথা কইছি, আমার স্ত্রী হয়তো অভিমানে ফুলচেন। জানো গাঙ্গুলি, 'বিধাতা যাদের প্রচণ্ড আঘাতে আঘাতে ধুলোয় মিশিয়ে দেছেন, একটুতেই তাদের আঘাত লাগে, আর সে আঘাত তাদের বক্ষে হয় দারুণ মর্মান্তিক!

দুজনে এলুম বেরিয়ে।

তারপর আহার …

১৬

তারপর ! যাকে বলে অগ্নিপরীক্ষা—

নিত্য যাতায়াত অন্নদাবাবুর গৃহে, চাকরিতে হঠাৎ একটা প্রোমোশন, কমাণ্ডিং অফিসার কিসে খুশি হলেন, বুঝলুম না। প্রোমোশনের সঙ্গে বদলি করা—এখানে রীতি, কিন্তু আমার উপর সে রীতির হলো ব্যতিক্রম।

সঙ্গীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন অন্তরঙ্গ, তাঁদের নয়নে মনে হিংসার স্ফুলিঙ্গ। স্পষ্ট শ্লেষ করে' তাঁরা জানালেন—বড়মানুষ মুরুব্বি যোগাড় করেছি—এ সব হলো সেই মুরুব্বির জোরে।

একজন বললেন—বাড়ীয়ালী বুদ্ধি একেই বলে। কোথা থেকে জুটলো গিয়ে কোটীপতি অন্নদা চক্করবত্তির ঘরে, চেহারা ভালো—ব্যস। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!

আর একজন বললেন—কিন্তু অন্নদা টাকা করেছে কি করে' জানো তো, সেরেফ দমবাজ, ধাপ্পাবাজ, জোচ্চোর—থাকে যেন ভিজে বেরালটি, তলে তলে কিন্তু—

আর একজন ফোঁস করে উঠলেন—জন্মখোঁড়া মেয়েরে! পা দুখানা ঐ দেহে আঁটা আছে শুধু ল্যাজের মতো ঝলমল করছে। মেয়ে না পারে চলতে, না পারে নড়তে। হুঁ, ও মেয়েকে যে বিয়ে করবে বাবা—

আর একজন নিশ্বাস ফেলে বললেন—যাক, খোঁড়াকে ধরে রাজ্যসুখ, তারপর রাজ্য পেলে কত পরী মিলবে, ভাবো, ঐ খোঁড়া মেয়ের টাকায়!

হা হা হা হা হা। অট্ট হাস্য।

অসহ্য হলেও নীরবে সহ্য করলুম। এঁরা আমার বন্ধু, দুদিন আগে আমাকে না হলে এঁদের চলতো না। হায়রে!

এক একবার মন বিদ্রোহে তেতে উঠতো, বয়ে গেল, খোঁড়া মেয়ে, ভদ্র—এই সব পা-ওলাদের মতো জানোয়ার নয়। তার সঙ্গ, তার সাহচর্য—ঢের বেশি কাম্য। যেচে এলা বলচে, করবো ঐ এলাকে বিবাহ এবং বড় মোটর নিয়ে এসে এদের সেই মোটরে চড়াবো—সবাই উঠবে নাচতে নাচতে, তারপর সেই মোটরে চড়িয়ে নিয়ে যাবো সকলকে, দেশ-গাঁ ছেড়ে বিজন কোনো তেপান্তরের মাঠে, সেই মাঠে দেবো ছেড়ে, বলবো—লোকালয়ে থাকবার লোক নোস তোরা, থাক এখানে এই জনহীন তেপান্তরের মাঠে।

এমনি উদ্ভট কত কথা মনে জাগতো, যখন ব্যারাকে থাকতুম, একা থাকতুম—সবার সঙ্গ এড়িয়ে।

কেউ এসে টাকা ধার চাইতো—বলতুম, এখনো বিয়ে হয়নি, শ্বশুরের ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্ট আমার নামে ট্রান্সফার করে দেবে, তখন দিব যত চাও, ধার নয়—দান, দান—দান—

টাকা না পেয়ে রাগে গড় গড় করে তারা চলে যেতো, বলতো—গাছে না উঠতে এক কাঁদি! এখন থেকেই এত টাকার গুমোর। এখানে এই। তার পর অন্নদাবাবুর বাড়ীতে···

অভিনয়—ডাক্তার আসেন এখন নিত্য। খেলা, গান, গল্প মনে জাগতো, বাস্তব জগৎ ছেড়ে আরব্য উপন্যাসের খাতায় ঢুকেছি, আদর-অভ্যর্থনা, সে কি সমারোহ! মনে মনে চমক লাগতো, মনে মনে আক্ষেপ হতো, আবার কখনো বিরক্তি! মনে হতো হাউই বাজির কথা! আকাশে ছুটে চলেছে আগুনের ছটায় ভরে, যেন আকাশ ছোঁবে

গিয়ে। কিন্তু কোথায় আকাশ, খানিকটা উঁচুতে গিয়ে ধুপ করে পড়তো কালো মাটীতে, ছাইয়ের স্তূপ।...মনে হতো, এই সব সঙ্গীরাই শেষে জুতো দিয়ে মাড়াবে—এখানকার অভিনয় শেষে নিজের জীর্ণতা দৈন্য নিয়ে আবার যখন ব্যারাকের জীব ব্যারাকে থাকবো বন্ধ।

এক হপ্তা অভিনয়, তারপর মুক্তি! কোন দায়িত্ব থাকবে না আমার! এনার সেই ভালোবাসা যে দিন হাবে ভাবে প্রথম হলো প্রকাশ, সেই শরমহীন সঙ্কোচহীন বরণ। তারপর সেদিকে যাইনি। দুখানা চিঠি—এসবের পর এনার সঙ্গে আবার দেখা হবার ক্ষণের কথা—আমার মনকে কতখানি উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল—তবু দেখা করতে হবে, অভিনয়—মানুষের জীবন নির্ভর করছে আমার এ অভিনয়ের উপর!

দেখা হলো, বুক আমার কাঁপছিল। দেখি সস্মিত মুখ এনার, আমাকে কাছে বসালো, মীরা গেল চলে। এনার দুচোখে আবেশ, কণ্ঠে প্রথম ভাষা ফুটলো—আমার উপর রাগ করোনি?

তুমি বলে সম্বোধন!

নিশ্বাস চেপে বললুম—না।

চাইতে পারলুম না এনার পানে। মনে কাপড়, নিয়ে বেচারীর সঙ্গে খেলা, এ চিন্তায় আমার মাথা মাটীতে নুয়ে পড়ছিল।

এনা বললে—আমার পানে তাকাচ্ছো না যে তবে?

তাকাতে হলো। জোর করে বেঁধে খানিকটা হাসি ফুটিয়ে বললুম—বাঃ, এই তো চাইছি!

এনা চোখ নামালো, বললে—আমার ভারী লজ্জা করছে, তুমি ভারী বেহায়া ভেবেছো আমাকে, না?

ছোট্ট জবাব দিলুম—না।

এনা বললে—এ ক'দিন আসো নি, কি করে আমার দিন কেটেছে, বলতে পারি না! কেন তুমি আসোনি?

বললুম—ডিউটি পড়েছিল, তার উপর বিধুর যেতে হয়েছিল ক্যাম্পিং করতে।

—আমাকে একখানি চিঠি লিখে জানালে কি দোষ হতো?

—দোষ নয়—মানে, হঠাৎ যেতে হলো, চিঠি লিখতে পারিনি।

—সেখানে গিয়ে লিখলে না কেন?

—পাঁচজনের সঙ্গে থাকা—কেউ ঠাট্টা করে যদি···

এনা একটা নিশ্বাস ফেললে, বললে—সে ঠাট্টা এমন বাজতো? আমার কিন্তু ঠাট্টাও ভালো লাগে! মীরা সব জানে, বলেছি ওকে। ও আমায় কত ঠাট্টা করে তোমাকে নিয়ে, এ সব ঠাট্টা আমার এত ভালো লাগে!

কোনমতে একটা জবাব কে যেন জুগিয়ে দিলে, বললুম—মীরার ঠাট্টা আর আমার ঐ সব নল-নীল-গয়-গবাক্ষ সঙ্গীদের ঠাট্টা! মীরা এসে আমায় করুক. ত্যাখো, কত তারিফ করবো সে-ঠাট্টার!

খুশি হলো এনা আমার এ কথায়, হাসলো। সে হাসি আমার বুকে বাজলো ছুরির ফলার মতো! বেচারী, খঞ্জ!

দ্বিতীয় দিনের কথা। এনা ছিল তার ঘরে। একজন মহিলা ছিলেন তার কাছে। বেয়ারা আমাকে সে-ঘরে নিয়ে এলো। অপরিচিতা মহিলাকে দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে আসছিলুম, এনা বললে—তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান ইনি।

পরে এলুম ভিতরে।

এনা বললে—ইনি হলেন এখানকার ব্যারিস্টার কুন্দনলালের স্ত্রী, আমার বন্ধু। তারপর মহিলার দিকে চেয়ে বললে—ইনিই—

মিসেস কুন্দনলাল মৃদু হেসে আমাকে বললেন—

আমার শিরায় শিরায় কাঁপন…

এনা বললে—তোমার গান শুনতে চান ইনি, একটা গাইবে?

মহিলা বললেন—প্লীজ…

গাইতে হলো। গাইলুম রবীন্দ্রনাথের সেই গান—

"সুন্দর-হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার,
তুমি অনন্ত চিরবসন্ত অন্তরে আমার"

দুজনে শুনলেন একাগ্র মনোযোগে, গান থামলে মহিলা বললেন—একসেলেণ্ট!

মহিলা এর পর নিলেন বিদায়, ঘরে এনা আর আমি।

আমি শুরু করলুম—মীরা দেবী কোথায়?

এনার কণ্ঠ হলো কুঞ্চিত, অভিমানের স্বরে এনা বললে—আমাকে সহ্য করতে পারচো না?

—না, না, তা কেন? এমনি জিজ্ঞাসা করছিলুম।

এনা বললে—মীরার নেমন্তন্ন আছে, বোধ হয় তাই গেয়েছে।

—ও।

এনা ডাকলো—বয়!

বয় এলো, এনা বললে—চা। বয় গেল চলে।

এমনি করে অভিনয়—না, আমার মুক্তি-সাধনা—চললো হাবে ভাবে ভঙ্গীতে সব সময় হুঁশিয়ার। সত্য বলে যেন মনে করে এনা, ফাঁকি না ধরা পড়ে।

যা-তা প্রশ্ন করে, আমি হয়তো অন্য কথা ভাবচি। সে প্রশ্ন কানে

আসে না, জবাব দিই না। এনা বলে ওঠে—তুমি শুনচো না আমার কথা? অপ্রতিভ হয়ে বলি—শুনচি বই-কি।

—না—কখখনো না, তুমি আর কি ভাবচো?

এনা অভিমান করে, চেয়ারে দুম করে মাথা হেলিয়ে দেয়, আমি চমকে উঠি—বুঝি কি বিপত্তি বাধে এখনি!

:

কখনো উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে বাহু বন্ধে টেনে নেয়, বহু প্রয়াসেও আমাকে আড়ষ্ট ভাব চেপে তার বাহুবন্ধনে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়।

এ অভিনয় কোথায় শেষে নিয়ে যাবে, বুঝতে পারতুম না। কখনো সলাজ্জ নীরব, কখনো উগ্র মুখর উচ্ছ্বাস—আমি নীরবে সয়ে থাকি, মনে পড়ে এনার চিঠিতে লেখা সেই কথাটা—আমাকে ভালো না বাসো—তোমাকে আমি ভালোবাসবো—সেটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত করো না।

সেদিন আমার হাত নিজের হাতে চেপে ধরে এনা গদগদ কণ্ঠে ভালোবাসার কথা বলছিল, আমার কানে এলো ঘড়ির ঘণ্টা, আটটা বাজছে। সেদিন আমাকে নটার মধ্যে ব্যারাকে ফিরতে হবে, হঠাৎ অতর্কিত হাতখানা নিলুম টেনে, এনা দুম করে চেয়ারের পিঠে মাথাটা দিলে হেলিয়ে।

আমি বলে উঠলুম—আহাহা। এমন করে—

কথাটা বলে এনার হাতখানা ধরতে গেলুম, এনা বললে—থাক, আর আদর দেখাতে হবে না।

মনে হলো—এনা কি বুঝতে পারছে—আমার কথাগুলো শুধু অক্ষর মাত্র, মনের মধ্যে এ সব কথার শিকড় নেই। মাঝে মাঝে এনা গম্ভীর

হয়ে ওঠে, আমার পানে চেয়ে থাকে, দুচোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—বুকখানা কেঁপে ওঠে—সন্দেহ করছে? ও দৃষ্টি দিয়ে আমার মনের গহনতল পর্যন্ত দেখতে চায়?…

এমনি ভাবে ভয়ে সংশয়ে বহুবার বিজয়গর্বে পাঁচটা দিন গেল কেটে।

ডক্টর মজুমদার নিত্য আসেন, তাঁর ট্রীটমেণ্ট চলেছে। ওদিকে দেরাদুনে যাবার আয়োজন। মজুমদার বলেন—বেশ ভালো রকম ফল পেয়েছি—স্টেডি ইমপ্রুভমেণ্ট। এই রেটে চলতে থাকলে, I am sure, তিন মাসে এনা গড় গড় করে' হাঁটবেন। দেখচেন না অন্নদাবাবু? এনার দুটি গালে healthy glow.

অন্নদাবাবু দেখেন, বলেন—হ্যাঁ। তাঁর মুখ হয় সস্মিত, হয় উজ্জ্বল!

আমিও দেখি, ভাবি—আরো একটি দিন কাটলো—নির্বিকার। তার পর ঐ পাঁচদিনের দিন—বিদায়-ক্ষণের কথা…

উঠলুম, যেতে হবে। দুজনের হাতে হাতে গ্রন্থিবাঁধা—নায়ক-নায়িকার মতো। কোমল কণ্ঠে বললুম—আজ আসি।

হাতের কবাজ ছাড়িয়ে এগুলুম, এনা বললে—কিছু দিয়ে যাবে না?

ফিরলুম—এনার উদ্যত অধর—বুঝলুম, এনা কি চায়, তার কপালে চুম্বন বর্ষণ করলুম—এনা বোধ হয় বুঝলো—প্রাণহীন আমার মুখখানা সরিয়ে দিয়ে বললে—থাক, আর আদরে কাজ নেই।

বলে' সে ফেরালো মুখ—ক্ষণিকের জন্য আমি যেন কাঠ, তার পর নিঃশব্দে এলুম চলে!

বোধ হয় ভুল করে' ফেলেছি। আর সে সব ভুল এনা ধরে ফেলেছে!

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সমস্ত ঘটনাগুলোকে করলুম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ।

যেখানে নারী তার মনের গোপন কথা পুরুষের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছে, সেখানে পুরুষের দশা যেন বারুদের স্তূপে বসে থাকা! একটু অসতর্কতায় নারীর অভিমানের বহ্নিস্ফুলিঙ্গে বিপত্তি! ভালোবাসায়, লোকে বলে, প্রিয় দৃষ্টি হয়, প্রিয়জনের স্নেহ-বিরাগের এতটুকু কণা সে দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, অন্ত জগতে এত মান, এত অভিমান। অনুরাগের বিরাগের অতি ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি প্রিয়জনে চোখে বড় হয়ে ধরা পড়ে, এতটুকু শৈথিল্য, এতটুকু অমনোযোগিতায় পাহাড় পর্যন্ত যায় টলে'!

বিষাদে মন ভরে গেল—পারলুম না কথা রাখতে? সাতটা দিন মাত্র—হায়রে!

কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনে কি ভয় কি দ্বিধা জেগে থাক, কেবলি মনে হয় এনা বুঝি বুঝতে পারছে—এ সত্য নয়, সত্য নয়, অভিনয় মাত্র। এর আগাগোড়া মিথ্যা! এবং সে কথা মনে জাগবামাত্র আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়!

ধৈর্য আর থাকে না—শক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসছে। এনার উচ্ছ্বসিত প্রেমাভিব্যক্তির মধ্যে আমি ক্ষণে ক্ষণে উৎকর্ণ হই, কেউ আসছে ঐ—চোখ ফিরিয়ে তাকাই দরজার দিকে, কেন আসচেন না অন্নদাবাবু? মীরাই বা কোথায় গেল? আমার সে ভাব দেখে এনা প্রশ্ন করে—কিছু চাইছো?

অপ্রতিভ হয়ে বলি—না—না—

এক একবার ধৈর্য টলে—মনে হয় বলি—কি তুমি চাও এনা, আমার কাছে? কোনোদিকে তাকাবো না? বেশ, যা পাচ্ছো যতখানি পাচ্ছো আমায়, এতে খুশি না হও, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু পারি না তা বলতে বা করতে—ডক্টর মজুমদারকে কথা দিয়েছি—সাতদিন, প্রাণপণে

আমিও অভিনয় করে' যাবো—এনার জীবন নাহলে সাংঘাতিক হতে পারে।

টেবিলের সামনে সকলে যখন বসি—আমাকে বসতে হয় এনার সামনাসামনি, অন্নদাবাবু তাই চান, মীরা তাই চায় ও ডক্টর মজুমদার তাই চান। কিন্তু এমন বাধ্য-বাধকতায় মানুষ ভালোবাসতে পারে না—ভালোবাসার অভিনয়, তাও হয় কঠিন।

পরের দিন, সময়ের একটু বেঠিক হলো। ইচ্ছা করেই করলুম। হোক অভিনয়—তা বলে' টাইম ধরে অমন আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো—

বুঝি আঘাত লেগেছিল।···

দেরির জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হলো। অন্নদাবাবু বললেন—ভাবনা হচ্ছিল, তাইতো এখনো এলে না—কোনো অসুখবিসুখ হলো না তো?

স্থান এনার ঘর—কেন না, এখন আর আমাকে কেউ সঙ্গে করে আনে না—সোজা এখানে গতি। দরোয়ান খানশামাদের সেলামেরও এখন ঘটা! এঁরা আর মীরা বসে তাস নিয়ে পেশেন্স খেলছিল।

অন্নদাবাবুর কথায় একটু নিশ্চিন্ত ভাবেই দিলুম জবাব—বলেন কেন সার, মিলিটারী ডিউটি! নতুন এক কমাণ্ডিং অফিসার এসেছে কাল, ঘোড়সওয়ার বলে' তাঁর মনে খুব অহঙ্কার—তিনি নিজে সোয়া আড়াইটায় ঘোড়ায় চড়ে বেরোন—এবং ঝাড়া এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়ে ঘোরেন। কোথায় ওদিকে দেহাত, তিনি ব্যবস্থা করেচেন, আমাদেরো বেরুতে হবে রোজ তাঁর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে টহল দিতে। যেতে হয়েছিল। ফেরবার আর নাম করে না সাহেব। একজন ঘোড়া থেকে গেল পড়ে, তবে মিললো ছুটি! কালও বেরুতে হবে—রোজ বেরুতে হবে আর যেরকম এর ঘোড়া-বাতিক, আজ এসেছি—কাল থেকে আর আসতে পারবো কি না, জানি না।

এনা আর মীরা খেলছিল তাস—নিবষ্ট মনে—আমার একথা যেন সাপের মাথায় নুড়ি পড়লো—সাপের মতোই এনা ফোঁস করে উঠলো, থাক থাক—এখানে আসা যদি এতই কষ্টকর হয়, নাই বা এলেন। আপনি না এলে আমাদের কিছু বাধবে না কোথাও, দিব্যি চলে যাবে'খন।

তার তীব্র ঝঙ্কারে ঘর শুদ্ধ লোক চমকে তার পানে তাকালো, অন্নদাবাবু হাঁকলেন—এনা!

এনার বয়ে গেছে সে কথা শুনতে—দুম করে মাথাটাকে হেলিয়ে দিলে সে চেয়ারের পিঠে, কিন্তু চকিতের জন্য, তখনি মাথা বেঁকে বসলো, বসে বললে—সত্যি বাবা, আমাদের অন্যায় ভদ্রলোককে তোমরা যেন মাইনে দিয়ে রেখেছো, নিত্য এখানে হাজিরা দিতে হবে। উনি অফিসার মানুষ, ওঁর লক্ষ কাজ আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, আমোদ-প্রমোদ আছে—এখানে এসে গারদখানায় বন্দী হয়ে থাকা—

মীরা তাকালো অন্নদাবাবুর পানে, অন্নদাবাবু তাকালেন মীরার পানে—কারো মুখে কথা নেই। আমিও হতভম্ব!

একটু পরে নিজেকে সম্বৃত করে নিয়ে আমি বললুম—তুমি বুঝবে না এনা, যখন বড্ড ক্লান্ত হয়ে কুকুরের মতো ধুঁকি, তখন আমার সঙ্গ মানুষের দেহে-মনে বিষ ছড়ায়, কথা কইবো কি—কথা আমার মুখে যোগায় না। এখানে যে করে' এসেছি, ঐ বিশ-ত্রিশ মাইল টইল দেবার পর, বার বার ভেবেছি, এখানে আজ সকলকে বিরক্ত করবো; কিন্তু তবু এলুম, তার কারণ তোমাদের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা কইলে আমি ভালো থাকি, আমার মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে—আমার সব শ্রান্তি চলে যায়। আজ নিজের প্রয়োজনে এসেছি আমি, কথা কয়ে গান গেয়ে তোমাকে সুখী করবো, সে সামর্থ্য আমার আজ না থাকলেও!

আমার কথা শেষ হবামাত্র এনা এমন তীব্র বিদ্রূপের হাসি হাসলো যে, আমার মন তাতে কুণ্ঠায় এতটুকু হয়ে গেল।

এনা বললে—ওরে মীরা, শোন্। হা—হা—হা, কি বলচেন আমাদের লেফটেনাণ্ট সাহেব! উনি নিশ্চয় দিন গুনছেন, কবে আমরা আপদের দল এ শহর থেকে বিদায় নেবো, ওঁর হাড়ে লাগবে বাতাস! ওঃ, কি দিন গুনে গুনে উনি বলেন—একেই বলে মিলিটারী ডিসিপ্লিন।

হাসি তার থামে না আর! সে হাসি দেখলে বুঝতে ভুল হয় না—হিস্টিরিয়ার হাসি।

আমি চুপ করে রইলুম, অন্নদাবাবু বললেন—তোমরা বসো, আমার একটু কাজ আছে। একটা ফোন করতে হবে, করেই আমি আসছি।

অন্নদাবাবু চলে গেলেন। নার্শ এলো, ট্রিটমেণ্টের ব্যবস্থামতো সে এখন করবে মেশাজ।

মীরা আমাকে সঙ্কেত করলো, আমি উঠলুম, এনাকে বললুম—আমি চলে যাচ্ছি না, মেশাজ হোক তার পর আসবো। মীরার সঙ্গে আমি এলুম বাইরে—মনে হচ্ছিল যেন খুব উঁচু থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়েছি, মাথাটা তেমনি যেন ঝিমঝিম করছে!

মীরা বললে—মেজাজ ওর এমন কেন, জানেন?

নিরুত্তরে তাকালুম মীরার পানে। মীরা বললে—এখানে থেকে ও যেতে চায় না, অথচ যেতেই হবে। গেলে সেরে উঠবে। এখান থেকে চলে যাবে বলে' ও এমন ভয়ানক খিটখিটে হয়েছে, আপনি জানেন না—

বললুম—আমি জানি—সব জানি মীরা, সেইজন্য কালও আমি আসছি যথাসময়ে—এনা যত রাগই করুক আমার ওপর।

১৭

ব্যারাকে ফেরবার পথে মনের মধ্যে রীতিমত কলরব। গল্পে উপন্যাসে পড়েছি, সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব! আমার মনে ঠিক যে সু আর কু বলে' দুটো মতি মাথা তুলে দ্বন্দ্ব বাধিয়েছিল তা নয়, দুটো দ্বন্দ্ব যেন মাথা ঝাড়া দিলে! এক পক্ষ বলছে—তোমার আত্মসম্মান, খুব হুঁশিয়ার—সেটা রেখো অটুট! এনার জন্য অনুকম্পায় যত বিগলিত হও, নিজেকে একেবারে বিসর্জন দেবে সে কারণে? এনা মান করে, অভিমান করে—তাতে টললে নিজের কী রইলো, বলো? শেষ পর্যন্ত নিজেকে অটল রাখতে হবে, আর দুটো দিন মাত্র। এ পরিশ্রমে যদি উত্তীর্ণ হও, জন্মের মতো মুক্তি! ধৈর্য, ধৈর্য, ধৈর্য রক্ষা করো—আর শুধু তিনটে দিনের জন্যে।

ডক্টর মজুমদার ঠিক কথা বলছেন—অজানার ভয় আমাদের বিমূঢ় করে' দেয়! কিন্তু সে অজানার সঙ্গে পরিচয় হলে ভয়ের মাত্রা অনেকখানি কমে! অনাগতের সীমা-নির্দেশ পাই—তার সেই সীমা বুঝে আমাদের শক্তির বিচার করা সম্ভব হয়, কিন্তু যা অজানা—তার বেলায় শক্তির কোনো মাপ করা দুরূহ হয়।

পরের দিন সকালে এদিককার ডিউটি সারলুম, প্যারেড এবং অন্য সব কাজ। কর্নেল বললেন—Well done my boys. তার পর তিনি বসলেন আমাদের ক'জনকে নিয়ে দিনের প্রোগ্রাম নির্ধারণে। এ অফিসারের ঘোড়ার বাতিক, সব সময় সওয়ারের সাজ পোশাক আঁটা, হাতে চাবুক। ঘোড়ায় চড়ে যদি চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে পারেন, তাহলে তাঁর আর চাইবার কিছু থাকে না!

আলোচনা চলেছে, একজন বয় এসে জানালো, ফোনে আপনাকে কে ডাকছে! চমকে উঠলুম। সকলে আমার পানে তাকালো। দু-একজন সঙ্গীর মুখে হাসি। একজন রসিক সঙ্গী শ্লেষের হাসি হেসে বলে উঠলো—The call—call of spring—তুমি এসো, তুমি এসো—কুঞ্জ-কানন কুসুমে ছাইল···মলয় সমীর ধীরে প্রবাহিল দু ভুজ আমার উদ্যত প্রিয়—তোমারে লইতে বক্ষে।··· হা হা হা···

গেলুম ফোনের ডাক শুনতে—মনে অস্বস্তি। আমাকে ফোনে ডাকবে আর কে? কিন্তু সকালেই এনার কি প্রয়োজন আমাকে? কালকের ব্যবহারে হয়তো মনে গ্লানি, তাই মার্জনা চাইবে?

রিসিভার নিলুম—মীরা ডাকছে। মীরা বললে—আজ আপনি না এলে ভালো হয়—এনা বেশ অসুস্থ।

উদ্বেগের কণ্ঠে বললুম—সিরিয়স রকম কিছু?

—না, না, তা নয়। তবে আজ ওর বিশ্রাম দরকার। বুঝছি! তাছাড়া একদিনে কি বা এমন হবে! যাবার দিন পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

—যাবার দিন পেছিয়ে দিতে হবে? আমার মনে জাগলো আতঙ্ক।

মীরা বললে—হ্যাঁ, চার-পাঁচ দিনের জন্য—যাইহোক, কাল মোদ্দা আসবেন, আপনি এলে কথাবার্তা হবে। আজ আর আসবেন না, বুঝলেন?

—বেশ! আমার কণ্ঠ হলো বন্ধ। ওদিকে আর কোনো কথা নেই। রিসিভার কানে দাঁড়িয়ে রইলুম, প্রায় দু মিনিট—কোনো সাড়া নেই—কেটে গেছে সংযোগ। রিসিভার দিলুম রেখে। আশ্চর্য হলুম, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে! যাবার দিন পিছিয়ে দেওয়া হলো কেন? তারিখ ঠিক, আয়োজন প্রায় কমপ্লীট। ডাক্তার মজুমদার

বলেছিলেন—এক হপ্তা মাত্র। আমার সঙ্গে এক হপ্তার চুক্তি! এক হপ্তার পর আমি হবো মুক্ত স্বাধীন, আমার কোনো দায় দোষ থাকবে না তার পর! কিন্তু এই দিন পেছুনো! না—আমার পক্ষে এ অভিনয় চালানো অসম্ভব! আমারো মন বলে একটা কিছু আছে, সেটাকে এমন ভাবে পা দিয়ে পিষে চলা—না, না, অসম্ভব!

কান-মাথা গরম হয়ে ওঠে—ঝাঁ ঝাঁ করছে—সমস্ত দেহে যেন জ্বরের উত্তাপ! চেয়ার ছিল পাশে, চেয়ারে বসলুম, ভালো করে' নিশ্বাস নেবো বলে! যাবার দিন পেছুনো—postpone—নিশ্চয় কিছু ঘটেছে। সত্যিই এনা অসুস্থ? আমার আচরণে ব্যথা পেয়েছে—খুব বেশি রকম! কিন্তু দেরাদুন যাওয়ার দিন পেছিয়ে দেবার কারণ? ডক্টর মজুমদার বলেছিলেন, এক হপ্তা পরেই যাওয়া—এ পাঁচদিন কি করে আমার কেটেছে—ওঃ!

বেরুলুম টেলিফোন রুম থেকে, সামনে করিডর, করিডরে দেখা করিমের সঙ্গে, ইয়ার লোক, করিম বললে—সকালেই লেডি-লাভের সঙ্গে প্রেমালাপ!

অসহ্য বোধ হলো! কটমটিয়ে তাকালুম করিমের পানে। করিম বললে—Lucky dog! সবাই এসেছি dull droll কাজে—নো রোমান্স, চারিদিকে নিয়মের রজ্জু! তোমার বেলায় ভাগ্যদেবী হলেন প্রসন্ন! কিশোরী কন্যা, সেই সঙ্গে রাজার রাজত্ব!…

এ কথার জবাব না দিয়ে অবজ্ঞাভরে পাশ কাটিয়ে চলে এলুম। কর্নেল বললেন—Yes, গাঙ্গুলি, আজ আমি ঘোড়ায় করে' যাচ্ছি মহারাজপুরে, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। যে ঘোড়া নিচ্ছি সেটা ভারী বদ—যদি কোনো সাহায্য দরকার হয়—

আমি প্রমাদ গণলুম। সওয়ার আমি তেমন নই, নিরীহ ঘোড়া পেলে তাতে সওয়ার হয়ে দশ-বিশ মাইল যেতে পারি, কিন্তু বখেড়া ঘটলেই মুশকিল! সাহেব অমন ঘোড়ুয়া লোক—সে বলছে, বদ ঘোড়া, সে বলছে যদি বেগড়ায় এবং কোনো রকম সাহায্য দরকার হয়···

কিন্তু এ কথা প্রকাশ করে বলা চলে না। এখনি সকলে বলবে, কাওয়ার্ড। মিলিটারী লাইনে ও-কথাটা [illegible] অচল।

বেলা আড়াইটেয় ঘোড়ায় চড়ে বেরুতে হবে। বেলা তখন দুটো, আরদালী এসে কার্ড দিলে—সার—

কার্ড নিয়ে দেখি—সর্বনাশ! অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী!

তিনি—হঠাৎ! দেহমন উঠলো কেঁপে, কেমন এক অজানা আতঙ্ক! নিশ্চয় ব্যাপার গুরুতর, না হলে তিনি আসবেন কেন আমার মত নগণ্য ব্যক্তির কাছে।

ওয়েটিং-রুমে এসে দেখি অন্নদাবাবু বসে আছেন চেয়ারে—চিন্তাক্লিষ্ট ভাব। [illegible] তিনি উঠে দাঁড়ালেন, কুন্ঠিত স্বরে বললেন—গাঙ্গুলি, হ্যাঁ, মানে, আমাকে ক্ষমা করো বাবা—তোমার ওপর এমন জুলুম করতে আসা—কিন্তু আমি নিরুপায়, অত্যন্ত নিরুপায়—

তাঁকে বসালুম—মন বিরূপ হলেও সে বিরূপতা যথাসাধ্য গোপন করে' সহজ কণ্ঠে বললুম—কি ব্যাপার বলুন তো—

তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, নত মুখে কি ভাবলেন, তার পর মস্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আমি জানি, আমার কোনো এক্তিয়ার নেই, এ ভাবে তোমার সময় নষ্ট করা। কিন্তু আমি কি করবো, তুমিই দাও আমাকে পরামর্শ—উপদেশ। আর আমি সহ্য করতে পারছি না! এনার কি হয়েছে, তার সঙ্গে কথা কইবার জো নেই, তার কাছে ঘেঁষতে ভয় করে শুধু আমার নয়, বাড়ীশুদ্ধ সকলের।

কারো সঙ্গে সে কথা কবে না—কাকেও কিছু বলচে না—সর্বক্ষণ গুম হয়ে আছে। আর আমি বুঝছি, রোগের জন্য নয়, মনে সে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে—she is desperately unhappy…আর যা করছে, তা গভীর হতাশ ভরে। কোনোদিকে আশার খেই ধরতে পারছে না বলে, বিশ্বাস করো বাবা, এ সব সে করছে in utter desperation

আমি তাঁর পানে তাকিয়ে রইলুম, নীরবে, নিরুত্তরে। এ সব কথার অর্থ? কি-বা এনা করছে এখন, যার জন্য…? হেঁয়ালি নয়, আমি স্পষ্ট কথা শুনতে চাই।

অন্নদাবাবু উদাস নয়নে চেয়ে রইলেন, দৃষ্টি টেবিলের উপর। অনেকক্ষণ পরে বড় একটা নিঃশ্বাস। নিঃশ্বাস ফেলে অন্নদাবাবু বললেন—দেরাদূনে যাবো—সব ঠিক, এনাও মত করেছে। ফার্স্ট ক্লাশ কম্পার্টমেন্ট পুরো রিজার্ভ, লোকজন যাবে—বিস্তর। বিস্তর লগেজ যাবে। তিন মাস সেখানে থাকা, বোঝো বাবা, everything arranged. কালও আমায় বলেছে এনা—খুশি মনে কি-কি জিনিস ওর চাই সেখানে, প্ল্যান করেছে—কি ভাবে ওখানে সময় কাটাবে। এত বই, বাঙলা নভেল, কাব্য, ফর্দ পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতার দোকানে—দেরাদূনের ঠিকানায় ভি. পি. করে' তারা যে যার বই পাঠাবে! জামা-কাপড় তৈরি করানো হলো ওর পছন্দমতো বই দেখে নিজে দর্জীকে ডিজা। বাৎলে। কিন্তু তুমি তো দেখে এসেছো হঠাৎ কি ঝাঁজ মেজাজ—তুমি এলে চলে—কিন্তু ওকে নিয়ে আমাদের অস্থিরতার সীমা নেই—কি হলো বললে না, কি চাই বলবে না! কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে ক্রমাগত হাত নেড়ে কেবল বলবে—তোমরা যাও-যাও, আমাকে বিরক্ত করো না; বলছে—এ-চিকিৎসা নয় তো, তার সঙ্গে আমরা করছি চালাকি—তার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি, তাকে মিথ্যা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা শুধু! ডক্টর

হঠাৎ আমার দুখানা হাত চেপে ধরে কম্পিত স্খলিত কণ্ঠে অন্নদাবাবু বললেন—তুমি তাকে রক্ষা করো বাবা, তাকে বাচাও, তুমি ছাড়া কেউ ওকে রক্ষা করতে পারবে না। তুমি ওর সর্বস্ব। তার পৃথিবী, তার প্রাণ সব এখন তোমাকে নিয়ে। দয়া করো, তাকে দয়া করো। আমি তার বুড়ো বাপ, আমাকে দয়া করো—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন, নাহলে-নাহলে এনা আত্ম-আত্মঘাতী হবে।

আমার চোখের সামনে অকূল সাগর যেন ফুলে উঠলো।

বৃদ্ধ বললেন—দোহাই, ওকে বাঁচাও, এনার প্রাণ—বড় ভালো মেয়ে এনা—বড় দুর্ভাগিনী, এমন করে' ওর চিরদিন কাটতে পারে না। কি ওর অপরাধ? দোহাই বাবা, মানুষের জীবন—তুমি দয়া করো, আমি তোমার পায়ে ধরে মিনতি জানাচ্ছি।

বলতে বলতে অন্নদাবাবু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন—কেঁদে আমার পায়ের উপর—

দুহাতে তাঁকে তুলে ধরে আমি বললুম—ছি ছি ছি, করেন কি আপনি! আমার সাধ্য যতখানি, আমি করতে প্রস্তুত আছি। আমি দেরাদুন যেতে রাজী, তিনমাস আমাকে যদি সেখানে থাকতে হয়, তাতেও আমি রাজী, যদি তাতে এনার মঙ্গল হয়। কিন্তু···

অন্নদাবাবু বললেন—শুধু তাই নয় বাবা। এনার কথা ভাবতে ভাবতে আমার হঠাৎ মনে পড়লো আমাদের পুরাণের কথা, অসুরদের মেরে দেবতাদের রক্ষা করতে দধীচি মুনি তাঁর জীবন দিয়েছিলেন, আর বেচারী এনাকে বাঁচাতে, তুমি তোমার—তোমাকে ছাড়া জীবনে সে কাকেও চায়নি কখনো, কিছু চায়নি এনা—

আমি বললুম—কিন্তু আপনি যা বলচেন তা কতখানি অসম্ভব—

বিহ্বল কণ্ঠে অন্নদাবাবু বললেন—কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো

কিছুতে এনাকে বাঁচান যাবে না। তুমি ওকে বিবাহ করো বাবা।

আমি বললুম—অসম্ভব অন্নদাবাবু, আমি গরীবের ছেলে, সামান্য মাহিনা পাই, কোটীপতির মেয়েকে আমি করবো বিবাহ?

অন্নদাবাবু বললেন—তুমি সুপাত্র, তা ছাড়া গরীব বলছো, এ বিবাহে আমার যথাসর্বস্ব আমি দেবো যৌতুক।

বাধা দিয়ে আমি বললুম—চিরদিন সকলে আমাকে বিদ্রূপ করবে, টাকার লোভে আমি···তা ছাড়া, টাকার লোভে বিবাহ যেন করলুম, তার পর আপনার কন্যাকে উপেক্ষা অবহেলায় সরিয়ে আমি যদি বিলাসলীলায় নিজেকে প্রমত্ত করে' তুলি, তাতে আপনার কন্যা সুখী হবেন তো?

হবে, হবে, তোমার সঙ্গে বিবাহ হলেই তার মন শান্ত হবে বাবা, তার বেশি সে প্রত্যাশাও করবে না তোমার কাছে, আমি তাকে একথা ভালো করে বুঝিয়ে দেবো···

—উহুঁ, তা হয় না।

অন্নদাবাবু হতাশভাবে আমার পানে চেয়ে রইলেন, তার পর বললেন—বেশ' তাহলে আর একটি অনুরোধ—

—বলুন।

—এনা যদি সেরে ওঠে, তার বৈকল্য না সারে, তুমি কথা দেবে, তাহলে তাকে বিবাহ করবে, নাহলে নয়, এতে সে আশা পাবে। সে আশায় সে সেরে উঠবে, ডাক্তার বললেন, এ দয়াটুকু। যৌতুক নয়, আমার মেয়ে তোমার দারিদ্র্য নেবে বরণ করে'। সে তোমায় ভালোবাসে, বাবা, টাকাকড়ি গহনা পোশাক—এসবে তার কোনো বাসনা নেই। বলো, বলো, কথা দাও, নাহলে আমি বাড়ি ফিরবো না,

ট্রেনের লাইনে মাথা পেতে পড়ে থাকবো, আত্মঘাতী হবো। বাঁচাও, বাঁচাও, দু-দুটো প্রাণী—

আমার দু'পা জড়িয়ে ধরলেন অন্নদাবাবু, ছাড়বেন না কিছুতে।

বললুম—বেশ, যদি সারে, বিবাহ করবো।

—আঃ! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তাহলে তাহলে একটিবার আমার ওখানে এসে এনাকে একবার এ কথাটুকু বলে আসবে? একথা বলেই চলে এসো।

—বেশ।

—যদি এনা সেরে ওঠে, মানুষের মতো হয়! দিলুম কথা।

মন তাতে আপত্তি জানালো না! অহঙ্কারে দুললো, একজনকে প্রাণ দিয়ে—তার ভার—ডক্টর মজুমদারের কথা মনে পড়লো···

এবং এনা কি সস্মিত ভাব, তার কণ্ঠে অমৃত, চোখের দৃষ্টিতে দীপ্তি। দেরাদুনে যাওয়া ঠিক—চারদিন পরে।

যেদিন যাত্রা তার আগের দিন বিকালে আমি যাবামাত্র এনা বললে—আমার কাছে বসো। আরো কাছে। কত কী ভাবছিলুম, বলবো তোমাকে।

বসলুম বেশ সহজ হয়ে। এনার কি বিশ্বাস আর নির্ভর আমার উপর! এনা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে—শুধু শুনে যাও চুপ করে কথা কবে না। বাবাকে বলছিলুম, তুমি কত ভালো, সত্যি বলছিলুম। শুধু দয়া নয়। তাহলে, জানো বাবাকে বলেছি, তোমার জন্য সেরে উঠতে ইচ্ছা হয় খুব, বাঁচতে ইচ্ছা হয়, নাহলে এতকাল এঁরা চিকিৎসা করেছেন, আমি চুপ করে সব সহ্য করে শুধু দিন গুনেছি—জানো, মৃত্যুর দিন। এখন কিন্তু মৃত্যু নয়, আমি বাঁচতে চাই, বাঁচবো শুধু তোমার জন্য।

কথার মধ্যে এনার মুখে ভাবান্তর—কখনো আশার উচ্ছ্বাস, কখনো লজ্জার রক্তিম আভাস! এনা বলতে লাগলো—আমি ভালো হবো, মানুষের মতো হবো, হাঁটবো, তোমার হাত ধরে, কত কত জায়গায় যাবো। সত্যি, দেরাদুনে গিয়ে আমি কঠোর তপস্যা করবো সেরে ওঠবার জন্য। জানো, কুমারসম্ভবে পড়েছি উমার তপস্যার কথা—কি কঠোর তপস্যাই করেছিলেন মহাদেবকে পাওয়ার জন্য। আমিও তেমনি তপস্যা করবো। অনেক দিন আগে একজন সাধু এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, তপস্যা করতে পারবি বেটী তাহলে সব রোগ সেরে যাবে তোর! সে কথা এখন কেবল মনে পড়ে। তপস্যায় সব মেলে। আমি তপস্যা করবো তোমাকে পাবার জন্য। কিন্তু ভয়ও হয়, যদি না সারতে পারি, এমনি থেকে যাই যদি, এমনি খোঁড়া—

বলতে বলতে তার দুটি চোখ হয়ে এলো বাষ্পে সজল, কণ্ঠ বিজড়িত, তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—পরে যা হবার হবে, অত ভাবতে পারি না। তাছাড়া, মন্দ আদবে ভাববো না, ভালোই ভাববো। ভালো যদি ভাবি সব সময় তাহলে ভালোই হবে, নয়?

উদ্যত নিশ্বাস চেপে বললুম—হুঁ!

—না, তুমি ভালো করে বলো, তুমি আমাকে আশা দাও, ভরসা দাও। তুমি যদি বলো, আমি সারবো, তাহলে নিশ্চয় আমি সেরে উঠবো। বলো তুমি!

সহজ কণ্ঠে আমি দিলুম জবাব, বললুম—সেরে উঠবে নিশ্চয়। আমাদের এত চেষ্টা, এ কখনো মিথ্যা হতে পারে না।

—আঃ! তুমি যখন বলচো—মিথ্যা হতে পারে না, তখন মিথ্যা হবে না কখনো—তোমাদের চিকিৎসা, আর আমার তপস্যা।—জানো,

ভগবানকে দেখিনি কখনো, কিন্তু তুমি আমার ——না, হেসো না—না, না, না…

আমি ভগবান! আর কিছু না স্বষ্টি করতে পারি, এনাকে করবো স্বষ্টি—নতুন জীবন দিয়ে।

এ কথাটা মনে গেঁথে গেল। এনার উপর বিরূপতা—অকপটে স্বীকার করছি, মনকে প্রশ্ন করে উঠলুম, এ বিরূপতা তার ঐ বৈকল্যের জন্য। মানুষ ভালোবাসে মানুষকে—জড়কে নয়। এনা জড় না থাকে যদি, মনে কেন বিরূপতা জাগবে?

যাবার দিন, বিদায় দিতে এসেছিলুম।

সব তৈরি—এনা বসে আছে তার জন্যে…সাজ পোশাকে মোহিনীর মূর্তি, বাহিরে ছুটোছুটি, জিনিসপত্র তোলা, প্রচণ্ড কলরব, সময় এলো এগিয়ে। এবারে গাড়ীতে ওঠো—গাড়ীতে চড়ে স্টেশন। সেখানে ট্রেনের কামরা আছে সাইডিং-এ, তাতে বসিয়ে দেওয়া—

এনা বললে—না, আমার পায়ে যেন জোর পাচ্ছি, আমি হাঁটবো, তুমি আমার হাত ধরো।

আমার পানে তাকালো। আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম চার-পাঁচ হাত দূরে, চকিতে কি যে হলো, এনা ক্রাচ ধরে দাঁড়ালো, তারপর ক্রাচ ফেলে দিয়ে—হঠাৎ যেন উটপাখীর মতো বাতাসে দুহাত মেলে দিয়ে আমার পানে আসতেই সকলে হাঁ-হাঁ করে উঠলুম; কিন্তু তাকে নিবৃত্ত করবার আগেই এনা নিজেকে দেছে ছেড়ে, ধরতে এগুলুম, এনা পারলো না, আমার পায়ের কাছে হুড়মুড় করে পড়ে গেল—পড়েই অজ্ঞান।

চীৎকার, হুটোপুটি। ডক্টর মজুমদার ছিলেন অন্য ঘরে, তিনি এলেন। সকলে ধরাধরি করে এনাকে বিছানায় দিলেন শুইয়ে। তারপর শুশ্রূষা, যাত্রা বন্ধ। এনাকে নিয়ে যমের সঙ্গে যুদ্ধ।

কিন্তু সব হলো মিথ্যা! আশার রঙ মনে নিয়ে কোথায় গেল ছায়ায় মিলিয়ে এনা।

তার পর?

আমার মনের উপর যেন পাহাড়ের ভার! যে মুক্তির কামনা করে অস্থির ছিলুম, চঞ্চল ছিলুম, এনা আমাকে সে মুক্তি দিয়ে গেছে, তবু, কই, কোথায় সে মুক্তির সহজ আরাম?

অসুখ বলে ছুটি নিলুম—ছুটি নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ালুম····· কোথায় আরাম? কোথায় শান্তি?

আমার চুক্তি রক্ষা করেছি। ডক্টর মজুমদারের সঙ্গে দেখা করিনি আর।

সব সময়ে এনা আছে আমার মন ভরে। তার কথা ভাবি আর মনে হয়, ভালোবাসা পাওয়া গৌরবের, গর্বের, কিন্তু ভালোবাসা যে পায় সে যদি অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ভাবে, আমার প্রাপ্য আদায় করছি। পূজা—যেন উপহার পাওয়া—জন্মদিনে যেমন আমারা পাই উপহার। কিন্তু ভালোবাসা তো উপহার নয়, এ যে প্রাণের অংশ! যে ভালোবাসে, সে দেয় তার প্রাণ-অংশ প্রিয় জনকে, প্রতিদান হয়তো চায় না, না চাইলেও তার উপর কি বাঞ্ছিত জনের কোনো কর্তব্য নেই? মনে হয়, ভালোবাসা পেলে তাকে অতি সাবধানে রক্ষা করতে হয়। যে ভালোবাসতে জানে, সে-ই শুধু জানে ভালোবাসার দাম। যে ভালোবাসে না, ভালোবাসার দাম সে বুঝতে পারে পাওয়া ভালোবাসা হারালে! আমার ঠিক তাই হয়েছে, এনাকে হারিয়ে তার ভালোবাসার দাম আমি বুঝেছি, তার আগে এ ভালোবাসার মর্ম, দাম কেন হায় বুঝিনি!

দু'মাস ছুটির পর চাকরি মিললো দেরাদুনে।

সেই দেরাদুন, যেখানে এনা চেয়েছিল আমার সঙ্গ।

আমার আকাশ, বাতাস সব হয়ে গেছে অর্থহীন।

দেরাদুনে দুমাস, তারপর ছুটতে হলো মেশোপটামিয়া—

সেখানে মানুষের প্রাণের কোনো দাম নেই ... নেবার জন্য সকলের কি প্রাণপণ প্রয়াস।

আমার মনে হলো, ঠিক জায়গায় এসেছি। আমি ঘাতক, এনার প্রাণ আমিই নিয়েছি। তাই ভগবান এই মহামৃত্যুর মাঝখানে আমাকে পাঠিয়েছেন!

কি করে তারপর যে এতগুলো বছর কেটে গেছে, আশ্চর্য মনে হয়। দিনের পর এসেছে দিন, দিনের পর মাস, মাসের পর বছর, ত্রিশ বছর গেছে কেটে।

আমি আজ নিঃসঙ্গ, মানুষের সঙ্গে তেমন প্রাণ... কোনো দিন মিলতে পারলুম না। চাকরি করেছি, দিনগত ... শেষ করেছি শুধু।

সব সময় মনে অপরাধের গ্লানি। এনা—এনা—হয়তো সে বাঁচতো, যদি দয়া না করে' তাকে ভালোবাসতুম। মানুষ কত কি চায়, মানুষের কাছে—টাকাকড়ি, আরোগ্য, চাকরি—তা দিতে আগ্রহও ... না মানুষের। বেচারী এনা ভালোবাসা চেয়েছিল আমার ..., দান নয়। কেন, কিসের অহঙ্কারে তা থেকে এনাকে করেছিলুম বঞ্চিত—

আমার সে দয়া, সে অনুকম্পা খুনীর ছোরার মতই সাংঘাতিক। আমার এ অপরাধের বিচার কে করবে? কবে করবে সে চিন্তায় আমি শিউরে উঠি।

জীবনে অনেক কিছু ভুলে গেছি। মানুষের কছে থেকে যে উপকার যে অপকার পেয়েছি, অপরের উপর আমার করা অনিষ্ট, কিছু ভুলিনি

শুধু এনাকে, আর এনার উপর আমার দয়ার আঘাত, করুণার বিষে এনাকে আমি হত্যা করেছি। সে হত্যার কথা…

যদি পরলোকে থাকে, সেখানে যদি এনার দেখা পাই, দেবে না সে আমাকে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করে' তার পাশে দাঁড়াবার অধিকার!

—শেষ—